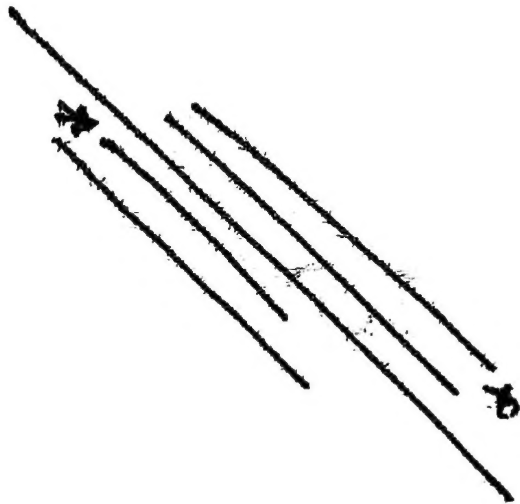
আমার জীবনের সত্য কথা

— মোঃ মনিরুজ্জামান

স্বরচিত পুক নং-১

আমার জীবনের সত্য কথা

—মো. মনিরুজ্জামান (মনি)



স্বরচিত বই নং ১

মনজুর প্রকাশনী

বাঁধাই, প্রচ্ছদ এবং ব্লক নির্মান :-
মো: মনিরুজ্জামান (মনির)

প্রথম প্রকাশ :- ৩০ শে আগষ্ট
১৯৯১।

মূল্য :- হাতের লেখা বিনামূল্যে
নেবেন তবে দলে দলে।
হবে না ভাই হবে না
দেব না ভাই দেব না।

* ভূমিকা *

অবশেষে অনেক কষ্ট সহ্যের পর "আমার জীবনের সত্যকথা" বইটি বের করতে সমর্থ্য হলাম। সঙ্গত কারনে বইটির প্রথম মুদ্রণ হাতের লেখার মাধ্যমে বের করলাম। লেখার বিষয়ে যদি কোন ত্রুটি হয় তাহলে আমাকে মাপ করে দেবেন।

এই বইটি লেখার পিছনে আমার সময় লাগ হয়েছে ৩০ ঘন্টা। তবে এক নাগাড়ে নয়। এই স্বল্প সময়ে আমাকে লিখতে হয়েছে ৬৫ দিনের বেলা। আর এই বইটি লেখার সময়

আমার বয়স ১৬ বছর এবং দশম শ্রেণীর ছাত্র।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং এই বইটি পড়ার আম-ন্ত্রন জানিয়ে ভূমিকা এখানেই শেষ করছি।

— মো: মনিরুজ্জামান
(লাকি)
৩০-৮-৯১

বি: দ্র:- এই লেখাটিতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। কারন, আমি কোন লেখক নই। বিখ্যাত লেখকের মতো লিখতেও পারি না।

[illegible]

- [illegible] "[illegible]" [illegible]

[illegible] ([illegible])

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
লও যত লৌহ লৌষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর।
হে নব সভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী।
দাও সে তপোবন পুণ্য ছায়া রাশি —

— অজ্ঞাত



যদি বাঁচার মত বাঁচতে চাও
তবে বেশী করে গাছ লাগাও।

— অনির

বি:দ্র:— লেখায় বহু ভুল-ত্রুটি হয়েছে বলে
ক্ষমা চাই।

৭৮৬

পৃথিবীর কথা বাদই দিলাম। বাংলাদেশের একজন নাগরিক হয়ে এ দেশ সম্পর্কে আমরা ~~এ দেশ সম্পর্কে~~ যে কতটুকুই বা জানি। এ দেশ সম্পর্কে জানার হয়তো কারও ইচ্ছা আছে, হয়তো নাই। কারও আবার ইচ্ছা আছে সুযোগ নাই। হয়তো কারও ইচ্ছা ও সুযোগ দুটোই আছে। আমার এই দেশ সম্পর্কে জানার একটা তীব্র ইচ্ছা ছিল এবং আছে। কিন্তু সুযোগ পায়নি কোন দিন। আমি সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। আমার আশা ছিল একদিন আমি ঠিকই সুযোগ পেয়ে যাব। আমার এই আশা প্রচণ্ড শক্তিশালী ছিল বলেই একদিন এই আশা সত্যিতে রূপান্তরিত হলো। অর্থাৎ আমি এ দেশ সম্পর্কে জানার একটা

সুযোগ পেয়ে গেলাম। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বলে আমি সুযোগ পাওয়ার আগে আগেই সিদ্ধান্ত নিলাম। জানি না আমার এই সিদ্ধান্ত ঠিক না ভুল হয়েছিল। হয়তো ভুল নয়তো নির্ভুল। থাক আর ভূমিকা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। কারন ভূমিকা দিয়ে তো আর লেখাটা শেষ করতে পারবো না। ভূমিকার সাথে দরকার বিস্তারিত বিবরনেরও। দেখি এমন কিছু বিবরন আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি কিনা, যাতে আপনারা একটু আনন্দ পেতে পারেন। কোন ত্রুটি হলে বিশেষ করে লেখার বিষয়ে তাহলে মাফ করে দেবেন। কারন আমি কোন কবি নই যে, ভাল-ভাবে নিজের ভাব লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবো। এবার তাহলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে মূল ঘটনা শুরু করি।

সেদিন ছিলো ২৭-এ জুলাই ১৯৮৭।

* আমার জীবনের সত্য কথা *

সকাল বেলা হতেই দিনটা আমার মনে ছিল। সকাল ৬টায় ঘুম থেকে উঠলাম। তারপর হাত-মুখ পরিষ্কার করে রীতিমতো পড়তেও বসলাম। কিন্তু পড়ায় মোটেও মন বসছিলো না। আমার পূর্বের সেই চিন্তাটি বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিল। ঘুরপাক খেতে খেতে চিন্তাটি এক সময় এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছলো যে, সেখান থেকে চিন্তাটাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। তাই নিতান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হলো আজই আমার সেই আশাটিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে। আমি এর জন্য সম্ভব সব রকম প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। তারপর কয়েকটা ঘন্টা আমার নিজের অজান্তে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল। একটা কথা বলতে তো ভুলেই গেছি, যখন এই খেলার শুরু হয় তখন

* আমার জীবনের সত্য কথা *

আমি পিতা-মাতা সহ স্বাচ্ছন্দ্য আদরে বাস করি। আর তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর এবং ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। এখন স্কুল ঘটনায় আবার ফিরে আসা যাক।

স্কুল সেদিন কি কারনে যেন বন্ধ ছিল। বেলা তখন আনুমানিক ১২-৩০টা। সম্ভবত আমার দেশ দেখার বা ভ্রমনের কোন কাজের জন্য আমি আমার পড়ার রুমে ঢুকেছিলাম। আমার পড়ার রুমেই ছিল আমাদের পরিবারের একটা আলমারি। আমি জানতাম ঐ আলমারিতে প্রায়ই টাকা থাকে। হঠাৎ কারনেই আমার নজর আলমারির উপর পড়লো। আলমারির দিকে চেয়ে দেখি আলমারি খোলা। আমি আস্তে বুক বেঁধে আলমারির আরও কাছে গেলাম আল্লাহ আমার প্রতি সহায় হলেন। দেখলাম অনেক টাকা। আনুমানিক ১৯০০-২২০০। আমার বুকের

* আমার জীবনের সত্য কথা *

-ভিতর তখন প্রাচীন দিল্লীর রাজ-প্রাসাদের খবর বলা শুরু করে দিয়েছে। আমি বেশী দেরী না করে ওখান থেকে ৩০০ টাকা নিয়ে পকেটে ঢুকলাম। তারপর আলমারির দরজা দুটো ভিড়িয়ে পড়ার টেবিলে এসে বসলাম। ~~তারপর~~ একটা বই খুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিলাম। মন দিয়ে পড়া তো না। একেবারে ভালো লোক দেখান পড়া। মা-বাবা যাতে সন্দেহ না করে তার জন্য এই ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। কিছুক্ষন পর যখন ভাবলাম এখন আর আমাকে কেউ সন্দেহ করবে না তখন টেবিল থেকে উঠলাম।

আমরা ছিলাম তিন ভাই। বাবা শখ করে আমাদের তিন ভাইকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। পরিবারের বড় ছেলে বলে সাইকেলের উপর

আমারই বেশী অগ্রাধিকার ছিলো। সাইকেলের চাবীটা সব সময় আমার কাছেই থাকতো। সাইকেলের চাবীটা নিয়ে সদর দরজার কাছে এলাম। সদর দরজায় এসে দেখি বাবা চেয়ারে বসে রয়েছেন। আমি মনে মনে যাই সন্দেহ করেছিলাম তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আমাকে বললেন," এই ভর দুপুরে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি ?"

আমি উনার উত্তরে বললাম," কোথাও না, এই দীপুদের বাসায়। দীপুর সাথে আমার কিছু কথা আছে।"

ভাবলাম বাবা তারপর আরও কিছু প্রশ্ন করবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। আমিও কোন মতে ছোঁ মেরে চাবীটা দিয়ে সাইকেলটা খুলে বাসা থেকে বের হয়ে পড়লাম। আমাদের বাসাটা ছিল তখন কলেজ পাড়ায় যখন আমি বাসা থেকে বের হলাম তখন আমার

আমার জীবনের সত্য কথা ৭

সম্বল ছিলো :- একটা লুঙ্গি, এক জোড়া স্যান্ডেল, একটি ফুল শার্ট, ৩০০ টাকা, একটি ঘড়ি আর একটি হিরো রয়্যাল সাইকেল। অর্থাৎ সর্বমোট যার মূল্য হতে পারে ২৫০০ টাকা। কালের পাড়া থেকে প্রথমে সাইকেল চালিয়ে ডায়না মোড়ে এলাম। দীপুদের বাসাটা ছিল থানা পাড়ায়। আমার এই বিদায় বেলায় দীপুকে দেখতে খুবই ইচ্ছা করছিল। কারন দীপু আমার বন্ধুদের ভিতর সবচেয়ে প্রিয়। তাই দীপুদের বাসার দিকে রওনা দিলাম। কিন্তু দূর্ভাগ্য আমার দীপুদের বাসায় পৌছে শুনি দীপু বাসায় নাই। কি একটা কাজে বাইরে গেছে। অগত্যা ওর সাথে দেখা না করেই আমাকে বিদায় নিতে হলো। আমি মাগুড়া শহরকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেশ ভ্রমনে বের হয়ে পড়লাম।

মাগুরা শহর হতে দুইটি বড় শহরের দিকে যাওয়া যায়। একটি হলো খুলনা, অপরটি হলো ঢাকা। যেহেতু ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী, সেহেতু ঢাকার উদ্দেশ্যেই রওনা হলাম। সাইকেল চালিয়ে ঢাকা রোডে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু ঢাকা রোড থেকে গাড়িতে চড়লাম না। কারন এখান থেকে গাড়িতে চড়লে হয়তো পরিচিত কেউ দেখে ফেলবে। তাই ঢাকা রোড হতে আরও উত্তরে যেতে লাগলাম। মাঝে মাঝে থেমে বাসের উদ্দেশ্যে হাত ও তুলেছি। কিন্তু কোন বাসই থামিনি। তাই বাসের উপর এক রকম রাগ করেই বাসের উদ্দেশ্যে আর হাত তুললাম না। এক মনে সাইকেলে প্যাডেল দিতে লাগলাম। প্যাডেল দিতে দিতে প্রায় ৫/৬ মাইল এসে গেছি। আর কিছুদূর পরেই কামারখালী ফেরী ঘাট। তাই আরও জোরে জোরে সাইকেল

প্যাডেল দিতে লাগলাম। খন খন প্যাডেল দিতে দিতে এক সময় কামারখালি পৌঁছে গেলাম। এবার একটু স্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কারন এবার নিশ্চই বাস পাব। সাইকেল নিয়ে ঘাটে ভিড়ানো একটা ফেরীতে চড়ে বসলাম। কিছুক্ষন পর একের পর এক বাস ফেরীতে উঠতে লাগল। মনের মতো একটা বাস পেয়ে ফরিদপুরে যাবার ভাড়া ঠিক করে তাতে চড়ে বসলাম। আমি দেখলাম আমার যত ভাড়া লেগেছে সাইকেলেরও তত ভাড়া লেগেছে। এই প্রথম বারের মতো আমি বুঝতে পারলাম সাইকেলটা আমার জন্য অতিরিক্ত বোঝা। বাসের আরামদায়ক সিটে বসে চলে এলাম ফরিদপুরে। বেলা তখন ৩টা। ফরিদপুরে কিছু খেয়ে-দেয়ে

মিনিবাস থেকে চলে এলাম দৌলদিয়া ফেরী ঘাট মিনি বাস থেকে নামার সময় গাড়ির হেলপার আমাকে বললেন, " ওদিকে যাবেন না।"

আমি বললাম, " কেন?"

-" ফেরীতে পুলিশ রয়েছে। তারা চোরাই মাল ধরছে। আপনার আইকেন যেহেতু ভারতের সেহেতু আপনাকে ধরতে পারে।"

আমি তার কথা বিশ্বাস করলাম। তবুও সচক্ষে দেখার জন্য ফেরী ঘাটেও গেলাম। গিয়ে দেখি সত্যি তাই। পুলিশ সেখানে রয়েছে। এক একটা গাড়ি ফেরীতে উঠছে আর পুলিশ গাড়ির ভিতর গিয়ে ~~পুলিশদের~~ যাত্রিদের চেক করছে। সুতরাং আমি আর ওদিকে পা না বাড়িয়ে যে দিক থেকে এসে ছিলাম, সে দিকে রওনা হলাম। আর তখন

লাগলাম, এখন উপায় হবে কি? নৌকায় হয়তো নদীটা পার হতে পারবো। কিন্তু সাইকেল শুদ্ধ নৌকায় নেবে না। তার উপর আবার ভারতের সাইকেল। যদিও এ দেশ ভাড়া নিচ্ছে বেশী চাইবে। এই সব আবল-তাবল কথা ভাবতে ভাবতে চলতে লাগলাম। আগে অর্থাৎ নৌকার মাঝিদেরকে জিজ্ঞেস করতেও দ্বিধাবোধ করিনি। কিন্তু তারা কেউ উপারে যেতে চাইলো না। তাই আমি প্রায় আশা ছেড়ে দিলাম। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে যখন বাসস্ট্যান্ডে এলাম তখন দেখলাম কিছু দুরে একটা লঞ্চ রয়েছে। লঞ্চটা নদীর তীরে ভিড়ানো। লোকজন অনেকেই সেই লঞ্চের দিকে যাচ্ছে। আমি শেষ চেষ্টা নেবার জন্য লঞ্চের দিকে গেলাম। আল্লাহ এবার আমার প্রতি সহায় হলেন। আমি লঞ্চে চড়ার

সুযোগ পেলাম। কিন্তু ভাড়া চাইলো ডবল। কারন নিশ্চই আপনারা জানেন। সাইকেলের জন্য। করার কিছুই নাই, তাই ভাড়া ডবল দিয়েই রওনা দিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। লঞ্চ তার গতিতে গন্তব্য স্থান অর্থাৎ আরিচা ঘাটের উদ্দেশ্যে চলতে লাগল। লোক মুখে জানতে পারলাম আরিচা ঘাট যেতে প্রায় ৭ ঘন্টা সময় লাগবে। তাই কম হলেও কিছু সময় হাতে পেলাম। আর সুন্দর পূর্ন গোল একটা চাঁদ উঠেছে। লঞ্চ থেকে চাঁদটাকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। চাঁদের আলো নদীতে পড়ায় নদীটাকেও সুন্দর লাগছিল। চাঁদ সম্পর্কে এরকম অভিজ্ঞতা এই আমার প্রথম হলো। চাঁদ যে এত সুন্দর হতে পারে তা আগে আমার জানা ছিল না। আমার মনে

* আমার জীবনের অন্ত কথা *

হলো চাঁদ আমাকে, আমায় এই দুঃসময়ে সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে।

এই সময়ে হঠাৎ আমার বাসার কথা মনে পড়ে গেলো। বাবা এতক্ষণে হয়তো খোঁজা-খুঁজি শুরু করে দিয়েছেন। হয়তো মা বাসায় বসে অপেক্ষা করছেন আমি ওনার কাছে ফিরে যাব। বাবা হয়তো কতক্ষণ খোঁজা-খোঁজির পর বাড়ি ফিরছেন। ওনার আশা, ফিরেই হয়তো দেখতে পাবেন আমাকে। যখন দেখবেন আমি বাসায় নেই, তখন হয়তো খুবই চিন্তিত হয়ে পড়বেন। মা হয়তো এতক্ষণে কান্না-কাটিও শুরু করে দিয়েছেন। আর ভাবতে পারলাম না। বলতে গেলে ইচ্ছা করেই ভাবনাটা মন থেকে মুছে ফেললাম। এই সব চিন্তা করলে হয়তো

আমার দেশ ভ্রমন আনন্দ-দায়ক হবে না।

ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেল পুরো একটা ঘন্টা। টেরও পেলাম না, এই সময়টা কোথা হতে হাওয়া হয়ে গেল। লঞ্চ আরিচা ঘাটে থামলো। মনে মনে খুশী বোধ করতে লাগলাম। কারন শেষ পর্যন্ত আরিচা ঘাটে পৌঁছতে পারলাম। সাইকেল নিয়ে লঞ্চ থেকে নামলাম। তারপর চলে এলাম আরিচা বাস ষ্ট্যান্ডে। সেখান থেকে একটা মিনি বাসে চড়ে চলে এলাম সাবতলী। মিনি বাসটিও আমার কাছ থেকে বেল ভাড়া নিল।

সাবতলী যখন পৌঁছলাম তখন সময় রাত ৭ টা। সাইকেল চালিয়ে কিছুদুর এগিয়ে দেখলাম একটা চার তলা হোটেল। আমি সাইকেল নিচে তালা দিয়ে রেখে, দোতলায় গিয়ে হোটেল

ম্যানেজারের কাছে জিজ্ঞেস করলাম," এখানে কি রাত্রে থাকার কোন জায়গা আছে ?"
- তিনি বললেন, " আছে ।"
- " সাথে সাইকেল রয়েছে ।"
- " অসুবিধা নেই ।"
- " এক রুম কত ।"
- " ৪৭ টাকা ।"
আমি আর কথা না বাড়িয়ে সাইকেল উপরে নিয়ে এলাম । তারপর ৪৭ টাকা দিয়ে একটা রুমের চাবি নিলাম । চাবি দিয়ে রুমটা খুলে সোজা সাইকেল ভিতরে নিয়ে এলাম । রুমের ভিতরে নজর বুলিয়ে দেখলাম, রুমের এক পাশে একটা সিংগেল খাট, আর অপর পাশে রয়েছে একটা টেবিল । টেবিলের উপর সযত্নে জগ আর গ্লাস সাজানো আছে । তার মধ্যে জগটা হলো পানি ভর্তি । আমার পেট-

তখন দারুন খিদে ছিল। তাই রুমে তালা দিয়ে আবার ম্যানেজারের কাছে এলাম। ম্যানেজার মাথা নিচু করে কি একটা কাজ করছিলেন। আমাকে কথা বলতে শুনেই মাথা তুললেন। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম — "আপনাদের এখানে কোন খাবার ব্যবস্থা আছে?" উত্তরে তিনি বললেন, "নাই, তবে কিছুদূর গেলেই খাবার হোটেল পেয়ে যাবে"।

এই বলে তিনি আবার কাজ শুরু করে দিলেন। আমি আর ওনাকে বিরক্ত না করে ওখান থেকে চলে এলাম। ঠিক করলাম এখন আর হোটেলে খাব না। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে খাওয়া যাবে। এই ভেবে আবার রুমে চলে এলাম। জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে পর পর দুই গ্লাস পানি খেয়ে নিলাম। তারপর বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলাম। এমনিতেই দিনের অর্ধেকটা সময় ব্যয় হয়েছে যা

যাতে। তাই শরীরটা ছিল দারুন এ খুব ক্লান্ত। তাই খুব অল্প সময়েই অধিক্ষরা হয়ে (ঘুমিয়ে) গেলাম।

যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন সময় সকাল ৬-৩০ টা। আমি বাথরুমে ঢুকে কিছু কাজ সমাধা করলাম। তারপর হাতের আঙ্গুল দিয়ে কোন মতে দাত মাজার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলাম। যখন মনে করলাম দাত অন্তত কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে, তখন হাত মুখে ~~পরিস্কার~~ পানি ছিটিয়ে বাথরুম থেকে বেড়িয়ে এলাম। আমার হোটেলে থাকা এখন নিষ্প্রয়োজন। তাই হোটেল থেকে আমার জিনিসপত্র নিয়ে বের হয়ে এলাম।

আমি তখন ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে

রয়েছি। ঢাকার রাস্তা ছিল তখন একদম ফাঁকা। সেই ফাঁকা রাস্তায় কতক্ষন সাইকেল চালালাম। যখন রাস্তা আমার মতো ছেলের চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়লো, তখন সাইকেল চালানো বন্ধ করলাম। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ৮টা বাজে। আমার ঘড়িটা এই অসময়ে ভাল উপকার করছিলো। সে ঠিক ঠিক সময়ে আমাকে সঠিক সময় জানান দিচ্ছিল।

আমার ছিল ক্ষুধার্ত পেট। তার উপর অনেকক্ষন ধরে সাইকেল চালানোর ফলে আরও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। আমার তখনকার প্রয়োজন ছিল পেটে কিছু দেয়া। তাই নিকটস্থ একটা একতলা হোটেলে ঢুকলাম। হোটেলের বেয়ারাকে ডেকে ৪টা পরাটা আর এক প্লেট ভাঁজি দিতে

বললাম। বেয়ারা খাবার দিয়ে গেল। আমি খেয়ে-দিয়ে হোটেল ম্যানেজারের কাছে উপস্থিত হলাম। ম্যানেজার কলিং বেল টিপলেন। সাথে সাথে কোথা থেকে যেন একটা সুর ভেসে এল,
" সাত টাকা।"
পরে লক্ষ্য করলাম আমাকে যে বেয়ারা খাবার পরিবেশন করেছে এ কন্ঠস্বর তার। আমি যখন ম্যানেজারকে টাকা দিতে যাব, ঠিক তখন কে যেন বলে উঠলো, " আরও ১টা টাকা বেশী দাও।"
আমি লোকটিকে চিনলাম না। আগে কখনও দেখেছি বলেও মনে হয় না। তাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, " কেন আপনাকে ১টা টাকা বেশী দিতে যাব?"
—" এমনি, একটা চা খাব।"

লোকটির চেহারা ছিল কিছুটা স্বাভাবিক মানুষ হতে ভিন্ন রকমের। তাছাড়া আমার ৭ টাকার জন্য কোন ফ্যাসাদে যেতে ইচ্ছা করল না। তাই অতিরিক্ত ১ টাকা সহ মোট ৮ টাকা দিয়ে হোটেল থেকে বের হয়ে এলাম।

আমার হাতে রয়েছে তখন মাত্র ১০০ টাকা। ভাবতে লাগলাম এই ১০০ টাকা দিয়ে আর কয়দিন বা চলবে। এর ভিতরে কোন একটা উপায় বের কর-তেই হবে। তা নইলে দফা-রফা শেষ। আমি রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছি (রাস্তার পাশ দিয়ে) আর এই সব চিন্তা ভাবনা করছি। হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সামনের দিকে। সামনের দৃশ্য দেখে আমি তো একেবারে হতবাক। যে জিনিসটি দেখলাম তা হলো বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা।

তবে এটা আসল শাপলা না। সিমেন্টের তৈরী-নকল শাপলা। যার চারিদিকে পানির ফোয়ারা আছে। আমি নকল শাপলাটাকে দেখছি আর সাইকেল চালাচ্ছি। এমন সময় কোনও সাইকেলের বা রিকশার টায়ার বার্স্ট হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি ভাবতেই পারিনি যে, আমার সাইকেলের টায়ারই বার্স্ট হয়েছে। নির্বিঘ্নে সাইকেল চালিয়ে যেতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর যখন একটা ছোট ইটের খোয়ার উপর দিয়ে সাইকেলের বার্স্ট হয়ে যাওয়া টায়ারটি গেল, তখন বুঝতে পারলাম আমারই সাইকেলের টায়ার বার্স্ট হয়েছে। সাথে সাথে নেমে পড়লাম সাইকেলের আরাম-দায়ক সিট থেকে। আমাদের অল্প কিছু দূরেই

তখন নকল আপেলটা রয়েছে। এখন কি করব, কিছু ভেবে না পেয়ে নকল আপেলটার কাছে গেলাম তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে। পরে জানতে পারলাম স্থানটির নাম আপেল চত্বর। আপেল চত্বরের পাশেই একটা ব্যাংক রয়েছে। ব্যাংকটার নাম এখন অবশ্য মনে পড়ছে না। সে যাই হোক, সাইকেলটা ব্যাংকের পাশে তালা দিয়ে রেখে ব্যাংক মোজাইক করা সিঁড়ির এক পাশে বসে পড়লাম। সেখান থেকেও সিমেন্টের তৈরী আপেলটাকে দেখা যাচ্ছিল। আমি আপেলটাকে দেখছি আর ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। এক সময়ে মন স্থির করে ফেললাম, আমার সাইকেলটা বিক্রি করে ফেলব। কিন্তু ক্রেতা পাব কোথায়? আমার

পাশে আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় এমনি একটা ছেলে বসে ছিল। আমি তাকে বললাম "ভাই আমি খুব বিপদে পড়েছি। এই সময়ে আমি যদি আমার সাইকেলটা বিক্রী করতে পারি তাহলে হয়তো কিছুটা বিপদ মুক্ত হতে পারবো। আপনি কি আমার সাইকেলটা বিক্রী করার একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন ? যদি পারেন তাহলে আমার খুব উপকার হয়।"

তিনি বললেন," তাই নাকি! দেখি তোমার কোন উপকারে আসতে পারি কিনা।"

এই বলে সে কোথায় যেন চলে গেল। যাওয়ার আগে ফিস ফিস করে কি যেন বলে গেল। যার বিন্দু বিসর্গও আমি বুঝতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ পর সে তিন-চারজন লোক নিয়ে হাজির হলো। আমাকে উদ্দেশ্য করে তাদেরকে সে বলতে লাগলো, " এই যে, এই ছেলেটা সাইকেল বিক্রী করতে চায়।"

লোক গুলোর মধ্য থেকে একজন সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, " তোমার সাইকেলের দাম কত?"
আমি ব্যবসায়ী লোকের মত বলতে লাগলাম, " নতুন সাইকেল, দাম আর কি বলবো। যে দামে কেনা তার থেকে তিন-চারশো টাকা কম দিবেন। কেনা হলো 2000 টাকায়, ১৬০০ টাকা দেন।

লোকটি বললেন, " চোরাই মালের দাম ১৬০০ টাকা! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে খোকা।
আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। লোকগুলো

বলে কি, আমার সাইকেল চোরাই মাল।
আমি বললাম, " কি যাতা বকছেন আপনি, এটা চোরাই মাল হতে যাবে কেন।"
—" তুমি বেশী বাড়া-বাড়ি করো না তাহলে ফল খারাপ হবে। আমি বলছি তুমি সাইকেলখানা ৩০০ টাকায় দিয়ে দাও।
—" ২০০০ টাকার সাইকেল ৩০০ টাকায়! একি মগের মুল্লুক পেয়েছেন। যান, আপনাদের কাছে সাইকেল বিক্রী করবো না।"
—" সাইকেল বিক্রী করবে না ভাল কথা। কিন্তু তোমাকে এখান থেকে সাইকেল নিতে দিচ্ছি না। এই সাইকেল থানায় যাবে। সেখান থেকে তুমি প্রমাণ দিয়ে তোমার সাইকেল নিয়ে যাও।"

এই বলে তারা আইকেল টানা-টানি শুরু করে দিল- আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। ঘাবড়ানোর সাথে সাথে খুব ভয়ও পেলাম। আমি তাদেরকে বললাম, " আর কিছু টাকা বেশী দেয়া যায় না।" একটা লোক বললো, " না, কোন মতেই না।" আরেকটি লোক বললো, " আচ্ছা ছেলেটা যখন এত করেই বলছে তখন আর একশ টাকা বেশীই না হয় দেয়া যাক।"

এই লোকটির কথায় আরও আর একটি লোক সায় দিলেন। সে ব্যক্তিটি সাইকেলের দাম ৩০০ টাকার বেশী দিতে চাইলো না সেও কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় লোকটির কথায় সায় দিলেন। তারপর তারা একরকম জোর করেই আমার হাতে ৪০০ টাকা গুজে দিয়ে সেখান থেকে তাড়া-

ভাড়ি মারে পড়লেন। তাদের তাড়া-তাড়ি মারে পড়ার কারন আমি তখন বুঝতে পারলাম না।

আইজেল খানা শেষ হওয়ার পর আমার সম্বল ছিলো ;– একটি লুঙ্গি, এক জোড়া স্যান্ডেল, একটি ফুলকার্ট, ৫০০ টাকা ও একটি ঘড়ি। যার সর্বমোট যে মূল্য হতে পারে ৮০০ টাকা। দেখতে পেলাম বাসা থেকে বের হবার সময় আমার মতে আমার কাছে ছিলো ২৫০০ টাকা। আর এখন একদিন হতে না হতেই ৮০০ টাকায় নেমে এলাম। বাকী ১৭০০ টাকা হাওয়া হয়ে উড়ে গেল।

ভগ্নপ্রায় মন নিয়ে কিছুক্ষন পর আদালত চত্বর ত্যাগ করলাম। তখন বাজে ১১ টা। আমি তারপর ঠিকানাহীন ভাবে ঢাকার এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এক স্থানে দেখলাম একদল

লোক অনেকগুলো আনারস সামনে নিয়ে বসে আছে। আমি ভাবলাম আনারস কিনে বিক্রী করতে পারলে হয়তো লাভ হতে পারে। এই ভেবে লোকটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাই আনারসের দাম কত?"

লোকটি উত্তরে বললেন, "একটার দাম ৭ টাকা। তুমি কয়টা নেবে?"

— "হিসেব করে দেখুন তো ২০০ টাকায় কয়টি পাব।"

তিনি কিছুক্ষন হিসেব করে বললেন, "প্রায় ২৮টি-৩০টা। তবে তুমি এক সাথে নিলে ৫/৬ টা বেশী পাবে।"

— "তাহলে আপনি গুনে ২০০ টাকার আনারস দেন।"

তিনি গুনে এক জায়গায় জমা করে রেখে বল-

লেন, " মোট পয়ত্রিশটা দিলাম।"
আমি ওনার টাকা পরিশোধ করে একটা রিক্সা ডাকলাম। রিক্সাওয়ালাকে বললাম, " ধারে-কাছে কোথাও কি আনারস বিক্রী করার মত কোন জায়গা আছে?"
রিক্সাওয়ালা বললেন, " আছে।"
- " কোথায়?"
- " ফকিরাপুল।"
- " ভাড়া কত?"
- " দশ টাকা।"
আমি ওনার সাথে বেশী কথা কাটা-কাটি না করে আনারসগুলো নিয়ে রিক্সায় চড়ে বসলাম। ফকিরাপুল পৌছার পর রিক্সাওয়ালা আমাকে আনারস নামাতে সাহায্য করলেন। তারপর সুন্দর একটা জায়গা বেছে নিয়ে তাতে সযত্নে আনারস-

খুলে আমিয়ে দিলেন। আমি ওনাকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি আমাকে বললেন, "সন্ধ্যার সময় আমি একবার আসবো। আর যদি না আসি, কমলাপুর রেল স্টেশনে ঘুমালেই আমাকে পাবা।"

আমি ওনার হাতে দশটা টাকা দিলাম। যাওয়ার সময় উনি বলে গেলেন, "যদি তুমি পান বেচার জন্য একটা বাক্স তৈরী করতে পার, তাহলে তোমাকে না খেয়ে থাকতে হবে না।"

আমি ওনার কথা বিশ্বাস করলাম। তার উপর উনি আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে তিনি এখানে একজন আসছেন। তাই আমার ভগ্নপ্রায় মনটা একটু স্বস্তি পেল। সহসাই লোকটার উপদেশের কথা মনে পড়লো। তিনি বলছিলেন

একটা পান বেচার (বিক্রী করার) বাক্যের কথা। আমার বিবেক তখন বলতে লাগল, "ছিঃ ছিঃ ছিঃ তুমি পান বেচবে। তুমি এত নীচ, এত নষ্ট"। আমি তাকে বোঝাতে লাগলাম যে পান বিক্রী করা খারাপ কিছু নয়। এদেশে এমন অনেক লোক আছে যারা জীবিকার জন্য এই পথটি বেছে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমি বিবেককে বোঝাতে অক্ষম হলাম।

ধীরে ধীরে বেলা ১২টা বেজে গেল। আমি আনারস বিক্রীর প্রতি মন দিলাম। একেকজন খদ্দের আসে। দাম জিজ্ঞাসা করে। দামে তার মত আর আমার মত এক না হলে সে চলে যায়। এক হলে টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু এ পর্যন্ত কারও সাথে আমার মত এক হয়নি। সুতরাং একটি আনারসও বিক্রী হয়নি।

গড়ে প্রতিটি আনারসের দাম পড়েছে ৬-৩০ টাকা। কিন্তু কোন খদ্দেরই ৫ টাকার বেশী দিতে চাইলো না। দেখলাম আনারস বিক্রী করতে হলে আমাকে কিছু লোকসান দিয়েই বিক্রী করতে হবে। তাই ঠিক করলাম এবার যে করেই হোক খদ্দেরের সাথে আমার একমত হতেই হবে। কিছুক্ষণ পর একজন খদ্দের এলো। তার সাথে আমার মত এক হল ঠিকই, কিন্তু ৫ টাকার উপরে দাম উঠলো না। সুতরাং তাকে ৫ টাকাতেই আনারস দিতে হলো। এভাবে প্রায় ৫০ টাকার মত আনারস বিক্রী হয়েছে। এমন সময় একটা লোক আমার কাছে এসে বললো, "আমি তোমার আনারস বিক্রী করে দিচ্ছি। তার বদলে তুমি আমাকে কিছু টাকা দিও।"

আমি লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। চোখে সব

হলো লোকটা ভাল লোকের মানুষ। আমি ভাবলাম উনি বিক্রী করলে হয়তো কিছু লাভও হতে পারে। তাই বিনা বাক্য ব্যয়ে ওনার কথায় রাজী হয়ে গেলাম। তারপর থেকে ঐ লোকটিই আনারস গুলি আমাকে নিয়ে বসে পড়লেন। আমি বসলাম ওনার পাশে। কোন খদ্দের আসলে লোকটি এক দাম চেয়ে বসে ৮ টাকা। তাই খদ্দেরের সাথে একবারও তার মত এক হলো না। সুতরাং একটা আনারসও উনি বিক্রী করতে পারলেন না। তখন সময় ১টা। আমি ওনাকে বললাম, " ভাই, এখানে গোসল করার মতন কি কোন পুকুর আছে?" —" আছে, কিন্তু একটু দূরে। তুমি এক কাজ কর একটা গামছা কিনে নিয়ে রিকশায় করে চলে যাও গোসল করতে।"

আমি ওনার কথা মতো একটা গামছা কিনে নিলাম। গামছাটার দাম নিলো ২০ টাকা। তারপর ঐ লোকটা একটা রিকশা ঠিক করে দিলেন। আমি সে রিকশায় গিয়ে দিলাম, গোসল করে আবার সেই রিকশায়ই ফিরে এলাম। পুকুরে মাত্র কয়েকটা ডুব দিতে পারলাম। এইটুকু পথে রিকশাওয়ালা ১০ টাকা দিতে হলো। আগুড়া হলে যেখানে ২ টাকার বেশী লাগত না। ফিরে এসে দেখি লোকটা একটা আনারসও বিক্রী করতে পারিনি। আমি ওনাকে বললাম, "ভাই, আপনি দাম কমান।"

তিনি তখন দাম কমিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার চেয়ে এক পয়সা বেশী দামেও বিক্রী করতে পারলেন না। লোকটি বিক্রী করছে আর আমি

বসে বসে দেখছি। এমনি ভাবেই সময় পার হতে লাগল। এক সময় আলোকের দিকে চেয়ে দেখি সূর্য্য আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে। অর্থ্যাৎ দিন শেষ হতে আর বেশী দেরী নাই। আমি ঐ লোকটাকে বললাম, " ভাই, আপনার কাছে কি কোন টাকা আছে ?"

তিনি বললেন, " কেন ? টাকা দিয়ে তুমি কি করবে ?"

— " না, কিছু না। বলছি কি, যদি থেকে থাকে তাহলে বাকী আনারস কয়টি আপনি কিনে নেন।"

— " আছে তবে, খুব বেশী না।"

— " কত ?"

— " এই ধর বিশ - পঁচিশ।"

আমি দেখলাম আমার আনারস আছে আর ও

পানেরোটি। বাকী ২০টা বিক্রী হয়েছে ১০০ টাকায়। দেখলাম সন্ধ্যা হচ্ছে আর বেশী দেরী নাই। ঢাকার লোক কেমন তা দিনেই আমার মনে হয়েছে। রাতে মানি তারা কতই ভয়ঙ্কর হতে পারে। তাই লোকটিকে বললাম, " ভাই, কি আর করবো, একে তো সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তার উপর আমার আনারস কখনো মাথে রাখার কোন ব্যবস্থা নাই। তাই একান্ত বাধ্য হয়েই আপনাকে এই আনারস কয়টি অতি অল্প দামে বিক্রী করতে হচ্ছে। আপনি আমাকে পঁচিশ টাকাই দেন। আমার মুখে এই কথা শোনা মাত্রই তিনি তড়িঘড়ি করে পঁচিশটা টাকা আমার হাতে দিয়ে আনারস গুলো নিয়ে গেলেন। তিনি সেখান থেকে চলে যাওয়ার পরও আমি সেখানে বসে রইলাম। সকাল বেলায় এক রিকশা ওয়ালা বলেছিলেন এখানে

আসবেন। কিন্তু সন্ধ্যা অবধি বসে থাকার পরও তিনি এলেন না। তখন লোক জনদের কাছে জিজ্ঞেস করে কমলাপুর রেল ষ্টেশনে চলে এলাম। তিনি বলেছিলেন এখানে থাকবেন। কমলাপুর এসে দেখি সে এক বিষম ব্যাপার। চারিদিকে শুধু লোক আর লোক। তার ভিতর থেকে একটা নির্দিষ্ট লোককে বের করা আমার কর্ম নয়। তাই ও আশা ছেড়ে দিলাম। আমি কমলাপুর রেল ষ্টেশন দেখার জন্য ষ্টেশনের একেবারে কাছে গেলাম। এক সময় ষ্টেশনের ভিতরে ঢুকেও পড়লাম। ষ্টেশনের ভিতর স্বাধিন ভাবে ঘোরা-ঘুরি করছি, এমন সময় এক জন পুলিশ এসে আমার কাছে ষ্টেশনের ভিতর প্রবেশ করার টিকিট চাইলো। কিন্তু আমি তাকে তা দিতে পারলাম না। অতঃপর সে আমাকে ধরে নিয়ে গেল একটা রুমে। সেই রুমে কয়েকজন লোক

বসে ছিল। আর তাদের সবার পরনেই ছিল সাদা পোশাক। পুলিশটি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, " এই ছেলেটি টিকিট ছাড়া স্টেশনে ঢুকে পড়েছে।"

তখন তাদের ভিতর একজন লোক আমার নাম লিখল। তারপর বললো, " ৭০ টাকা দেবা না জেলে যাবা ?"

—" আমি কি অন্যায় করেছি যে, ৭০ টাকা দিতে হবে, নইলে জেলে যেতে হবে।"

—" তোমার অন্যায় তুমি টিকিট ছাড়াই স্টেশনের ভিতর ঢুকে পড়েছো।"

আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, "আচ্ছা, টাকা কিছু কম দিলে হয় না ?"

—" ২০ টাকা কমিয়ে দিলাম। ৫০ টাকা দাও।"

—" আর কিছুই কি কমানো যায় না।"

—" তাহলে তোমাকে জেলে যেতে হবে।"

– " আচ্ছা, ঠিক আছে। এই নিন ৫০ টাকা।"
তিনি ৫০ টাকা পকেটে পুরে নিয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে বললেন। পুলিশ তখন আমাকে ছেড়ে দিল। আমি ছাড়া পেয়েই দেখতে পেলাম, একটা ট্রেন এই মাত্র চলতে শুরু করেছে। আমি এক দৌড়ে ট্রেনটার একটা কামরায় ঢুকে পড়লাম। যে দরজা দিয়ে আমি ট্রেনে ঢুকলাম, সেই দরজার সামনেই একটা পুলিশ বসে ছিলো। সে আমার মুখের উপর লাইট মেরে বললো, " তুমি কে? এই ট্রেনে চড়েছ কেন?"
– "সামনে যাব।"
– "কত টাকা আছে।"
আমাকে বলার সুযোগ না দিয়েই আমার পকেট থেকে সব টাকা তুলে নিলেন। তারপর বললেন, "এই টাকা গুলো তোমার ভাড়া হিসাবে নিলাম।"
– " এতগুলি টাকা ভাড়া! এ আপনি বলেন কি?"

—" বেশী কথা বললে এই টাকা থেকে একটা টাকাও তুমি ফেরত পাবে না।"

—" দেখুন, আমি অতি সাধারন একটা ছেলে। আমার টাকা নিয়ে আপনার কোন লাভ হবে না।"

—" আমিও অতি সাধারন একটা পুলিশ। সব টাকা তোমাকে ফিরিয়ে দিলে আমারও কোন লাভ হবে না।"

—" তাহলে আপনি না হয় কিছু টাকা রেখে আমার বাকী টাকা ফেরত দেন।"

—" পঞ্চাশ টাকা দিতে পারব।"

—"মাত্র পঞ্চাশ টাকা। আর সব টাকা আপনারা খুব খাবেন"

—" বেশী বাজে বকো না। এই নাও আরও ২০ টাকা।"

—" আর কিছুই কি দেওয়া যায় না।"

—" আরও কিছু চাও নাকি। তাহলে এই নাও লাঠির বাড়ি।" এই বলে তিনি ওনার লাঠি দিয়ে মারতে লাগ-

লেন। তাই আমি আর উনার সাথে কথা বাড়ালাম না। উনার কাছ থেকে সরে পড়লাম। পরে হিসাব করে দেখলাম, পুলিশটি আমার কাছ থেকে 200টাকা মত নিয়েছে। ট্রেনটা একটা স্টেশনে এসে থামলো। আমি ঠিক করলাম এই স্টেশনেই নেমে পড়বো। তারপর যা হয় একটা কাজ খুঁজিয়ে নেব। আমি যখন ট্রেন হতে স্টেশনে নামলাম তখন সময় রাত দশটা। লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম স্থানটির নাম টিটিয়া। আমার মনে পড়লো অনেক আগে, আমার বয়স যখন খুব অল্প ৬ কি ৭। তখন বাবা টিটিয়ার একটা টেক্সটাইল মিলে চাকরি করতেন। বাবার সাথে আমি, মা, ও ছোট ভাই এক সাথে থাকতাম। তখন আমরা ছিলাম দুই ভাই। কিন্তু সেই সময় টিটিয়ার সাথ

এই সময়ে টিকিট কোন মিল খুঁজে পেলাম না। আমি ষ্টেশনের বেঞ্চের উপর বসে আছি, এমন সময় এক বাদাম ওয়ালা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, "বাদাম দেবো?"
আমি তার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, "এক প্যাকেট কত?"
— "এক টাকা।"
— "এক প্যাকেট দাও।"
সে আমাকে এক প্যাকেট বাদাম দিলে আমি তাকে একটা টাকা দিলাম। তারপর বাদামের খোসা ছাড়িয়ে এক একটা বাদাম মুখে দিতে লাগলাম। আর দেখতে লাগলাম কোন মানুষ পেট বাঁচার জন্য কত বিচিত্র পন্থা অবলম্বন করছে। আমিও ভাবতে লাগলাম, দেখি এদের মত কোন কাজ করতে পারি কিনা

তখনই মাথায় চলে এল, চানাচুর বিক্রী করলে ক্যামন হয়। এই ধান্ধাটার মধ্যে হয়তো আমি কোন আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলাম। তাই সেই সময়েই ঠিক করে ফেললাম আগামিকাল থেকেই আমি চানাচুর বিক্রী শুরু করে দেব। সেই সময়ে আমার একটি মাত্রই প্রয়োজন ছিলো। তা হলো, রাতে থাকার মতো কোন জায়গা বের করা। সেই উদ্দেশ্যে ষ্টেশন থেকে বের হলাম। ষ্টেশনের নিকটেই দেখলাম একটা আবাসিক হোটেল। হোটেল ম্যানেজারের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, এখানে এক রাত্র থাকতে ৩০ টাকা লাগে। আমি আর কি করবো, ওনাকে ৩০ টাকা দিয়েই রাত্রে থাকার মতো একটা রুম বেছে নিলাম। বিছানায় শোয়ার পর এত চেষ্টা করলাম ঘুমাবার জন্য। কিন্তু ঘুম কিছুতেই এলো না।

বাসা থেকে এসেছি আজ দেড় দিন মতো হলো। ভাবছি বাসায় বসে মা এখন করছে কি। হয়তো তিনি এতক্ষনে পুরোদমে কান্না জুড়ে দিয়েছেন। বাসার কথা আর ভাবতে পারলাম না। ভাবতে লাগলাম এখনকার অর্থাৎ বর্তমানের কথা। মনে মনে ঠিক করলাম কালকে ঘড়িটা বিক্রী করে চানাচুর বিক্রী করা শুরু করে দিতে হবে। তারপর আল্লাহ পাক যা হয় করুন। এই সব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা উঠে হোটেল কল থেকে হাত-মুখ পরিষ্কার করলাম। তখন সময় সকাল ৭টা হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে আবার ষ্টেশনে এলাম। উদ্দেশ্য সময় কাটানোর। কারন আমি জানতাম ঘড়ির দোকান ৮ টার আগে খুলবে না। তাই-

এই ১টি ঘন্টা হাতে পেয়ে ষ্টেশনে এসে বসলাম। বসে বসে দেখতে লাগলাম ষ্টেশনের লোকজনদের। আমার নজর বেশী পড়ছিলো তাদের উপর, যারা ষ্টেশনে চানাচুর বিক্রী করে। ভালভাবে তাদেরকে দেখে চানাচুর বিক্রী করার কলা-কৌশল রপ্ত করে নিলাম। যখন আমার ঘড়িতে ৮টা বাজল, তখন ষ্টেশন ত্যাগ করলাম। ষ্টেশন হতে প্রায় কোয়াটার মাইল যেয়ে একটা ঘড়ির দোকান পেলাম। ঘড়ির দোকানদেরকে বললাম, " ভাই, আমি এই ঘড়িটা বিক্রী করতে চাই।" তিনি আমার কথা শুনে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, " এ যে দেখছি পুরোন ঘড়ি।"

— " পুরোন ঘড়ি হলেও এর দাম ভাল।"

—"কত দাম চাও।"
—"১৫০ টাকা দেন।"
—"পুরোন ঘড়ির দাম এত টাকা!"
—"আগেই তো বলেছি এর দাম ভাল।"
—"না বন্ধু, আমি তোমার ঘড়ি কিনতে পারলাম না। তুমি বরং অন্য দোকানে যাও।"
—"আচ্ছা কিছু টাকা না হয় কমই দেন।"
—"আমি ৯০ টাকা দিতে পারবো।"
—"আর কিছু বেশী দেওয়া যায় না।"
তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "আর ১০ টাকা বেশী দিতে পারবো।"
শেষ পর্যন্ত ১০ টাকা বেশী অর্থাৎ ১০০ টাকায় দাম ঠিক হলো। আমি ওনার সাথে বেশী কথা না বাড়িয়ে ঘড়িটা ওনার হাতে দিলাম। তিনি-

সময় উনি আমাকে ১০০ টি টাকা দিলেন। ঐ টাকা দিয়ে বৈশির বাজার থেকে চানাচুর বিক্রীর জন্য একটা ঝুড়ি, ~~প্রাস্টিকের ঝুড়ি~~ কয়েকটা লেবু, ১ পোয়া পিঁয়াজ, ১ ছটাক কাঁচা মরিচ ও আরও কিছু জিনিস কিনলাম, যা চানাচুর বিক্রী করার জন্য প্রয়োজন। তারপর মুদির দোকান থেকে কিনলাম ২ কেজি চানাচুর। পিঁয়াজ-মরিচ কাটার জন্য একটা ছুরি কিনলাম ফুটপাত থেকে। সব কিছু কেনার পর পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, পকেটে আর মাত্র ১০ টাকা রয়েছে। আমি টাকার কথা চিন্তা না করে চানাচুর বিক্রীর প্রতি মন দিলাম। চানাচুর ঝুড়ির ভিতর সাজিয়ে রাখলাম। একটা ছোট্ট পলিথিনের কাগজে মরিচ আর পিয়াজ কেটে এক সাথে রাখলাম। যাতে খদ্দের আসলে

-কষ্ট কম হয়। এই কৌশলটা আমি রপ্ত করে-ছিলাম স্টেশনের চানাচুর বিক্রীওয়ালার কাছ থেকে। যখন সব প্রস্তুতি শেষ হলো, তখন চানা-চুর বিক্রী করতে নেমে পড়লাম।

প্রথম প্রথম বিক্রী করার সময় মনের ভিতর কি রকম যেন করতে লাগল। কিছুদিন পর অবশ্য তা ঠিক হয়ে গেল। কোন ট্রেন এসে স্টেশনে থামলে, আমি ট্রেনের কাছে গিয়ে, 'চাই চানাচুর, চাই চানাচুর' বলে হাঁক দিতাম। আমার ডাকে কেউ সাড়া দিত, কেউ দিত না। অর্থাৎ কেউ চানাচুর কিনতো, কেউ কিনতো না। এমনি ভাবে চানাচুর বিক্রী করতে করতে কেটে গেল অনেক সময়। সূর্য্য যখন আমার মাথার উপর চলে এল, তখন চানাচুর বিক্রী করা ক্ষান্ত দিলাম। বের হলাম গোসল করার মত পুকুরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঘাড়ে-কাড়

গোসল করার উপযুক্ত কোন পুকুর পেলাম না। অনেক কষ্টে পেলাম ছোট একটি পুকুর। পুকুর তাকে বলা যায় না। বলা যায় ডোবা। তাতে গোসল করা চলে না। কিন্তু উপায় কি? গোসল করতেই হবে। অগত্যা সেই ডোবায়ই গামছা পরে গোসল করতে নামলাম। গোসল ~~শেষ~~ করে গামছা পাল্টিয়ে আবার লুঙ্গি পড়লাম। তারপর ক্লান্ত পায়ে স্ফূর্তি নিয়ে ষ্টেশনের পাশের একটা হোটেলে ঢুকে পড়লাম। হোটেলটাতে কিছু খেয়ে-দেয়ে আবার ষ্টেশনে এসে চানাচুর বিক্রী শুরু করে দিলাম। এমনি ভাবে সন্ধ্যা শেষ হওয়ার পরও অনেক সময় ধরে চানাচুর বিক্রী করলাম। যখন পিঠের কাছে পেট আত্ম সমর্পন করলো, তখন আবার ষ্টেশনের পাশের সেই হোটেলটিতে গেলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার চানাচুর বিক্রী শুরু করলাম। চোখ ঘুমের কাছে যখন আত্ম সমর্পণ করলো, তখন ঠিক করলাম আর আর হোটেলে ঘুমাব না। ষ্টেশনেই ঘুমিয়ে পড়বো। দেখলাম ষ্টেশনের প্লাটফর্মে অনেক লোক ঘুমিয়ে রয়েছে। আমিও তাদের মাঝে আমার গামছা খানা বিছিয়ে ঝুড়ি খানা মাথায় নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা উঠে দেখি আমার পায়ের স্যান্ডেল নেই। ভাবলাম হয়তো ষ্টেশনের কোনো চোরই চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি তাড়া-তাড়ি ঝুড়ির দিকে তাকালাম। ভাগ্য ভাল ঝুড়িটা নিয়ে যায়নি। স্যান্ডেল চুরি হওয়াতে আমি মন কিছুটা কষ্ট পেলাম। কিছুক্ষণ পর কষ্টটা মন থেকে তাড়িয়ে দিলাম। তারপর হাত-মুখ পরিষ্কার করে আবার চানাচুর বিক্রী

শুরু করে দিলাম। রাত্র হলে প্রতিদিনের মত সেখানে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল হলেই আবার- চানাচুর বিক্রী করা। এমনি ভাবেই কেটে গেল পুরো ১৫টি দিন। মাঝে মাঝে চানাচুর অথবা অন্য কোন জিনিস ফুরিয়ে গেলে, দোকান অথবা বাজার থেকে কিনে আনতাম। মানুষ কোন কিছু বিক্রী করে কিছু না কিছু লাভ পায়। আমিও চানাচুর বিক্রী করে লাভ পেয়েছি। কিন্তু আমার পেট তো সে লাভ শেষ করেছেই তার উপর আবার কিছু লোক-সানও করেছে। তাই ১৫ দিন পর দেখলাম আমার কাছে ঝুড়ি আর কয়েকটা জিনিস ছাড়াও টাকা-পয়সা এম- নকি বিক্রীর- জন্য কোন চানাচুরও নেই। তখন ঠিক করলাম দিল্লীতে আর নয়। এখন অন্য কোথাও পাড়ি জমাতে হবে। আমি একটা লোকের কাছে ১৫

টাকা দিয়ে চানাচুর বিক্রী করার প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র বিক্রী করে দিলাম। ১৫ টাকায় ঐ দিন কোন মতে চালালাম। তার পরের দিন ট্রেন আসতেই অন্যান্য লোকের (যাদের ভাড়া নেই) মতো ট্রেনের ছাদে উঠে বসলাম। তখন আমার সম্বল ছিল একটা ফুল হাতা শার্ট, একটা লুঙ্গি আর একটা গামছা। তখন আমাকে দেখলে ভদ্রলোকের ছেলে বলে মনেই হতো না। সে যাই হোক, আমি তখন ট্রেনের ছাদে বসে ট্রেনের এক পাশের দৃশ্য দেখ-ছিলাম দেখছি, তার খানিক পরে আর একপাশের দৃশ্য দেখছি। এমনি ভাবেই পার হতে লাগলাম স্টেশনের পর স্টেশন। ছাদে বসা একটা লোকের কাছ থেকে জানতে পারলাম এই ট্রেনটি চট্টগ্রাম যাচ্ছে। ভাবলাম ভালই হলো চট্টগ্রামে

আজে একটা সুন্দর জায়গাতে সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারতো । সূর্য যখন মাথার উপর তখন সেই জানালো তার সমস্যার কথা । আমি বললাম পয়সা নেই । আমার উত্তর শুনে সে সেই সময়ের মত চুপ করলো । চুপ করলো ঠিক না, চুপ করালাম । কিছু-ক্ষণ পর সে আবার যখন তার সমস্যা কথা জানালো, তখন ট্রেন একটা স্টেশনে থেমে আছে । আমি তাড়া-তাড়ি ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের পাশের একটা হোটেল থেকে দুই গ্লাস পানি সেই চালাককে দিলাম । তার-পর আবার ট্রেনের ছাদে বসলাম । ট্রেন আবার চলতে শুরু করলো । এক সময় সে চট্টগ্রাম সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়লো । তখন ধীরে ধীরে

চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। তবুও আমি এই স্বল্প আলোতে যা দেখলাম তা কল্পনার অতীত। দেখলাম ছোট ছোট পাহাড়। তার উপর জন্ম নিয়েছে অনেক বিচিত্র ধরনের গাছ। মাঝে মধ্যে দেখলাম ট্রেনের রাস্তা পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে। বিকেলের আকাশে কিছুক্ষণ আগে সূর্যের যে লাল আভা দেখেছিলাম, তাও এখন নেই। পূর্ব আকাশে চেয়ে দেখলাম সুন্দর চাঁদ উঠেছে। মনে পড়লো আমি এক চাঁদের রাতে ছিলাম আড়িয়াল নদীতে। চাঁদের আলোতেই দেখতে লাগলাম আশে পাশের সৌন্দর্যকে। এক জায়গায় দেখলাম দুটো পাহাড়ের মাঝে খালের মত সরু একটা নালা। চাঁদের আলো নালার পানির উপর পড়ে চিক চিক করছিলো। আমি চারিদিকের সৌন্দর্য উপভোগ

কাঁদি আর কাঁদি। অন্য দিকে আমার কোন খেয়াল নাই। যখন অনুভব করলাম ট্রেনের গতি আস্তে আস্তে থামছে তখন খেয়াল ফিরলো। আমি বুঝতে পারলাম ট্রেন ষ্টেশনে থামবে। একটা লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এটা চট্টগ্রামের পাহাড়তলী রেল জংশন এ ষ্টেশন। ট্রেন থামার সাথে সাথে সব লোক নামতে শুরু করে দিল। আমিও তাদের পথ অনুসরণ করে নামতে লাগলাম। আমার পেটে তখন প্রচণ্ড খিদে। কিন্তু পকেটে ১টা পয়সাও নেই। তার উপর আবার অচেনা জায়গা। তাই কোন সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে একটা রাস্তা বরাবর হাঁটতে শুরু করে দিলাম। কত-দূর হেঁটে দেখলাম একটা সুন্দর হোটেল। তার-সামনে কয়েকটা বেঞ্চ পাতা ছিল। ক্ষুধার তাড়নায়

আমি আর হাঁটতে পারছিলাম না। তাই একটা গাছের উপরে বসে পড়লাম। ক্ষুধার ঝলে আমার নাড়ি-ভুঁড়ি সব শেষ হয়ে আসতে চাচ্ছিল। আমি জোর করে তাদের শরীরের ভিতর ঠেস দিলাম। তাদেরকে আরাম দেবার জন্য কয়েকবার পর পর হোটেলের ভিতর গিয়ে পানি খেতে লাগলাম। কিন্তু পানি আর কত খাব। আমাকে সারা দিনটা তো পানি খেয়েই সাবাড় করে দিলাম। আমার পেট কি আর কোন দিন ভরে খাবার পাবে না। না এমনি ভাবেই আমার জীবনের অবসান ঘটবে। বাড়ি থেকে এলাম কি করতে। কত সুখের জীবনই না ছিলাম। মা-বাবার বড় ছেলে বলে যাই চেতাম, তাই

যেতাম। আবার পরক্ষণেই ভাবতে লাগলাম, সেই দুঃখের চেয়ে এই দুঃখই আমার কাছে ভাল। এতে মানার কিছু আছে। এমনি সব চিন্তা-ভাবনা করছি, এমন সময় একটা লোক এসে বসলো আমারই বেঞ্চে একটু দূরে। তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমাকে লক্ষ্য করলেন। তারপর বললেন, "বাড়ি কোথায়?"

— "বরিশাল।"

— "এখানে কে আছে?"

— "কেউ নেই।"

— "আর কিছু খেয়েছ?"

— "না, শুধু পানি।"

— "কি! পানি ছাড়া আর তুমি আর কিছুই

খাওনি।"
— "না মা।"
— "আমার সাথে এ দিকে এস। দেখি তোমার খাবারের কোন ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।"
এই বলে তিনি আমাকে হোটেলটির ভিতরে নিয়ে গেলেন। ওহো আপনাদের বলতে তো ভুলেই গেছি আমার আসল বাড়ি বরিশাল। মাগুরাতে বাবা চাকরী করতো, তাই মাগুরাতে থাকতাম। সে যাই হোক, ঐ লোকটি আরও কয়েকজন লোকের কাছ থেকে কিছু টাকা যোগাড় করে হোটেলে বসিয়ে আমাকে খাওয়ালেন। পেট এত খিদে থাকা সত্ত্বেও বেশী খেতে পারলাম না। তবুও পেটে দুটো দানা-পানি পড়ে এটাই সান্ত্বনা। তার-পর আবার এসে সেই বেঞ্চিটার উপরে বসলাম।

ধীরে ধীরে লোকজন সবাই হোটেল হতে চলে যেতে লাগল। আমিও এক সময়ে উঠে দাঁড়ালাম। উদ্দেশ্য রাতে থাকার মত কোন জায়গা খুঁজে বের করা। রাস্তা বরাবর কিছুদূর হেঁটে একটা দোকানের সামনে দেখতে পেলাম অনেকখানি শান বাঁধানো খালি জায়গা। তাতে লোকজন ঠাসাঠাসি করে ঘুমিয়ে রয়েছে। আমি অতি কষ্ট করে তাদের ভিতর একটু জায়গা পেলাম। সেই জায়গার উপর গামছা পেতে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়তে না পড়তেই রাস্তার যত ঘুম আমার চোখে এসে জড়ো হলো। সুতরাং আর না ঘুমিয়ে থাকতে পারলাম না।

ঘুম থেকে যখন জাগলাম তখন,

সূর্য্য আমাকে উঁকি দেয়নি। ঘাটের কাছে একটা টিউব-ওয়েল পেয়ে গেছেই তা থেকে হাত-মুখ পরিস্কার করে নিলাম তারপর পুরানো বস্তাটা হাতে শুরু করলাম। যখন দোকান খুললো তখন দোকানে কাজ পাওয়া যায় কিনা, তারও চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কোন দোকানেই কোন কাজ খুঁজে পেলাম না। হোটেলেও খোঁজা-খুঁজি করেছি। কিন্তু সেখানেও নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছি। যখন ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে পারতাম না, তখন নিকটে কোন হোটেল পেলেই সেখান থেকে পানি খেয়ে নিতাম। এমনি ভাবেই সারা দিনটা পার হয়ে গেল। সন্ধ্যার পরও ফিরলাম

কাজের জন্য খোঁজা-খুঁজি করলাম। কিন্তু আল্লাহ্ আমার প্রতি সহায় হলেন না। তাই কোন কাজ খুঁজে পেলাম না। যখন দেখলাম রাত অনেক হয়েছে, তখন কাজ খোঁজা বাদ দিয়ে খুঁজতে লাগলাম গতরাতের সেই হোটেলটি। আশা, হয়তো আবার সেই লোকটির দেখা পাব। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর শেষ পর্যন্ত হোটেলটা খুঁজে পেলাম। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সেই লোকটিকে হোটেলের দিকে আসতে দেখলাম। আমাকে দেখা মাত্রই তিনি বলে উঠলেন, "একি, আজও কি তুমি কিছু খেতে পাওনি।"
আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "না।"
—"কোন কাজ খোঁজার চেষ্টা করেছ।"
—"করেছি, কিন্তু ----"

—"কিন্তু পাওনি, এই তো বলতে চাচ্ছ।"
—"হ্যাঁ।"
—"আচ্ছা এখন এস কিছু খাবে। কাল আবার কাজের জন্য চেষ্টা কর।"
তিনি পুনরায় আমাকে খাওয়ালেন। খেয়ে-দেয়ে আবার চলে এলাম সেই জায়গায়। গতকাল যেখানে রাত কাটিয়েছিলাম সেখানে। মনে মনে ঠিক করলাম কাল যে করেই হোক একটা কাজ খুঁজে বের করতেই হবে। এই ভেবে লোক-জনদের ভিতর ঠাসা-ঠাসি করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আবার সেই টিউব-ওয়েল হতে হাত-মুখ পরিষ্কার করলাম। তারপর [illegible] হাঁটতে লাগলাম। দোকান-পাট খোলতে শুরু করলে দোকান ওয়ালাদের জিজ্ঞেস করাতেও

ভুল করিনি। কিন্তু তারা কোন কাজ দিতে পারল না। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর একজন দোকানওয়ালা কাজ দিতে পারবেন বলে বললেন। তবে তার নিজের দোকানে নয়, তার পরিচিত একটা হোটেলে। আমি রাজি হয়ে গেলাম তার কথায়। তখন তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন হালি শহরের ছোট্ট একটা হোটেলে। তিনি হোটেল ওয়ালার সাথে কিছু কথা বললেন। তার পর আমাকে আড়ালে ডেকে কিছু উপদেশ দিয়ে সেখান হতে বিদায় নিলেন।

আমি কাজ পেয়ে গেলাম হোটেলে। কিন্তু হোটেলের কাজের আমি 'ক' ও জানিনা। তাই কাজ করতে প্রথম প্রথম আমার খুব অসুবিধা হতে লাগল। আমাকে দেওয়া হলো হোটেল টেবিলের কাজ। আমার কাজ হলো কোন লোক হোটেলে এলে তার

পাছে এগিয়ে যাওয়া, তিনি কি খেতে চান জানতে চাওয়া এবং খাবার পরিবেশন করা। তাছাড়া আরও অনেক কাজ আমাকে করতে হতো। যেমন:- পুকুর হতে প্রতি দিন কলস ভর্তি করে পানি আনা, টেবিল পরিষ্কার করাসহ হোটেল পরিষ্কার করা, ইত্যাদি।

হোটেলে আমি আমার পরিচয় দিয়েছিলাম এই বলে যে, আমার কোন মা-বাপ নেই। তাই তারা (হোটেলের লোকেরা) মোটা-মুটি ভাল চোখেই দেখত। হোটেলের কাজ করতে করতে কয়েক দিন কেটে গেল।

একদিন পাশের একটা মুদির দোকানের ছেলে কথা প্রসঙ্গে আমার কাছে জানতে চাইলো, —"সত্যিই কি তোমার কোন মা-বাপ নেই।"

আমি তার মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থাকলাম। কোন উত্তর দিতে পারলাম না। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো –, "সত্যিই কি তোমার কোন মা-বাবা নেই?"

এবার আমার মুখ খুলল। আমি তাকে বললাম, "সত্যি কথা বলতে পারি এক শর্তে।"

–"কি শর্তে?"

–"তুমি আমার কথা কাউকে বলবে না।"

–"কাউকে বলব না।"

–"তোমার মাথা ছুঁয়ে বল।"

–"ঠিক আছে, এই আমি আমার মাথা ছুঁয়ে বলছি, কাউকে বলবো না।"

–"তাহলে শোন, সত্যি বলতে কি আমার মা-বাবা সবাই আছে।"

—" তাহলে এখানে যে বললে, তোমার মা-বাবা কেউ নেই।"

—" মিথ্যা বলেছি।"

—" কি কারণে মিথ্যা কথা বলতে গেলে।"

—" কারণ, আমি কোন কাজ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যেখানেই কাজ খুঁজতে গিয়েছি সেখানেই আমি সত্যি কথা বলেছি। আমার সব কথা শুনে তারা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন ঠিক করলাম দেখি মিথ্যা কথা বলে কোন কাজ পাই কিনা। কি আশ্চর্য! মিথ্যা বলার সাথে সাথে এই হোটেলে কাজ পেয়ে গেলাম।"

—" তুমি খুব অন্যায় করেছ।"

—" আমি স্বীকার করছি আমার খুব অন্যায় হয়েছে।" তোমার কাছে তুমি এই কথাটি কাউকে বল না।"

সে মিটি মিটি হেসে বললো, "ঠিক আছে, বলবো না।"

তার মিটি মিটি হাসার কারন তখন বুঝতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম তখন, যখন হোটেলওয়ালা আমাকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বললেন, "বের হয়ে যা আমার হোটেল থেকে। মা-বাপ থাকতেও বলেছিস মা-বাপ নেই। মিথ্যেবাদী কোথাকার। যা, বের হয়ে যা।"

আর চিৎকার শুনে অনেক লোক সেখানে জড়ো হল। তারা কি ব্যাপার বুঝতে পেরে মাটিতে থু থু ফেলতে লাগলেন। আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না। লজ্জায় দ্রুত পা চালাতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে সামনের দিকে। যাওয়ার সময় দেখলাম সেই ছেলেটি ঠিক সেই রকম-

* আমার জীবন সত্যকথা *

তাকে আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসতে লাগল। তাকে দেখে আমার রাগ হবার কথা। কিন্তু আমার কোন রাগ হলো না। বরং বিবেক আমাকে বোঝাতে লাগল নিজেকে শোধরিয়ে নাও মন। আমি বিবেকের উপদেশে সায় দিলাম। মনে মনে ঠিক করলাম আর মিথ্যা কথা বলব না। আর চোলাইও না। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার। যখন হোটেল থেকে বের হয়েছিলাম তখন সন্ধ্যা হতে কিছু বাকি ছিল। এখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে গে- গেল। আমি হাঁটছি, এমন সময় আমার একটা লোককে দেখে থেমে গেলাম। একদিন কি জানে সে [রাতে] হোটেল থেকে বইয়ে

কে হয়ে দিলাম। সহসা কোথা থেকে যেন এই লোকটি এসে আমার হাত ধরলো। তারপর বললো, "তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে।"
– "কোথায় ?"
– "তা পরে বলবো।"
এই বলে তিনি আমার হাত ধরে টানতে লাগলেন। আমি সহসা বুঝে ফেললাম উনি কে। উনি আমাকে ধরি ধরে নিয়ে হয়তো আমাকে মেরে ফেলবেন। তারপর আমার শরীরের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (যেমন :- চোখ, রক্ত, কিডনি, হৃদপিন্ড) চড়া দামে বিক্রী করবেন। আর তা নাহলে আমার পা ভেঙে আমাকে কোন এক স্থানে ভিক্ষা করতে বসিয়ে দেবেন। ভিক্ষা করে যা পাব সবই উনি নিয়ে নেবেন। বিনিময়ে আমাকে দেবেন দু মুঠো ভাত। এই সব কথা চিন্তা করে আমার

বুকটা ঘিড়াস ধিড়াস করতে লাগল। মনে মনে ফন্দি আটতে লাগলাম কিভাবে ওনার হাত থেকে কাটতে পারবো। এখন হয়তো আমি চিৎকার করে লোক যুড় করতে পারি। কিন্তু ও সাহস আমার হলো না। তাই খুজতে লাগলাম অন্য কোন উপায়। আমার নিজের অজান্তেই উপায়টা আমার হাতে চলে এল। এতক্ষন উনি আমাকে ওনার দুই হাত দিয়ে ধরে রেখেছিলেন। যখন দেখলেন আমি নড়া-চড়া করছি না। উনি যে দিকে ইচ্ছা নিয়ে যাচ্ছেন। তখন উনি আমাকে দুই হাতের বদলে এক হাত দিয়ে ধরে রাখলেন। এই অবস্থাকে আমি উত্তম সুযোগ মনে করে ওনার হাতে বসিয়ে দিলাম জোরে একটা কামড়। কামড়ের জ্বালায় উনি আমাকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। ওনার

নিমেষ মুহূর্তেই আমার হাত ওনার হাত থেকে মুক্ত হয়ে গেল। হাত মুক্ত হওয়া মানেই আমার নিজের মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। আমি এই সম্ভাবনা কে বাস্তবে পরিণত করার জন্য দিলাম আমার সর্বশক্তি দিয়ে জোরে দৌড়। দৌড়ে আমার সাথে খুব কম লোকেই পারতো। স্কুলের ক্রীড়া অনুষ্ঠানে প্রায়ই দৌড়ে একটা প্রাইজ পেতাম। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। উনি আমাকে ধরার জন্য দৌড় দিলেন ঠিকই। কিন্তু ধরতে পারলেন না। এক দৌড়ে পৌঁছে গেলাম হোটেলে। আমার আর আশা তারই সাথে দেখা হবে। এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমাকে দেখে উনি বিজয় হাসি হাসলেন। ওনার হাসি দেখে আমি ভয়

পেয়ে গেলাম। পরে আমার কাছে এসে উনি বললেন
"কি হে, সেদিনকে ঐ রকম দৌড় দিয়েছিলে
কেন?"
আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। উনি আবার
বললেন, "সে যাই হোক। এখন আমার সাথে
এস। এক কাপ চা খাবে।"
আমি ভাবলাম উনি চা খাওয়ানোর কথা বলে
আমাকে হয়তো অন্য কোথাও নিয়ে যাবেন। তাই ওনাকে
বললাম, "আমি চা খাইনা।"
— "চা খাওনা, তাই বলে এখন খাবেনা, এমন
তো কোন কথা নেই।"
আমি দেখলাম ওনার সাথে আমি কথায়
পারবো না। তাই চুপ করে রইলাম।
কতক্ষণ পর উনি আবার বললেন, "তোমার কোন
ক্ষতি আমি করবো না। আজ থেকে তোমাকে আমি ভাই

বলেই গ্রহন করে নিলাম।"
আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, উনি আমাকে কথার মাধ্যমে ভুলাতে চাচ্ছেন। এই কথার মাধ্যমে কাউকে ভুলানো, আমাদের স্কুলের ছাত্রদের (বিশেষ করে আমার ক্লাসের ছাত্রদের) একটা হবিতে পরিণত হয়ে ছিল। আমাদের ভিতর সবসময় একরূপ প্রতিযোগীতা লেগেই থাকতো, কে কত কাউকে কথার মাধ্যমে ভুলাতে পারে। দৌড়ের মত এ প্রতিযোগিতাও আমার সাথে অনেকে পারতো না। সেই ভরসাতেই ওনার সাথে কথার প্রতিযোগিতায় নামলাম। আমি ওনাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, "আপনি আমাকে যেহেতু ভাই বলে স্বিকার করে নিয়েছেন, সেহেতু আমার জিনিস আপনি আর নাইবেন না।"
উনি বললেন, "আসলে, তুমি খুব চালাক।

তোমার সাথে আমি চালাকীতে পারলাম না। স্বীকার করছি আমি একটা খারাপ লোক। খারাপ লোক হিসাবে তোমাকে আমি একটা উপদেশ দিচ্ছি। তা হলো, আমার কাছ থেকে তুমি হয়তো রক্ষা পেয়ে গেছ। কিন্তু এই শহরে আমার মত আরও অনেক খারাপ লোক রয়েছে। তাদের হাত থেকে তুমি রক্ষা নাও পেতে পার। তাই বলছি কি, তাড়াতাড়ি যে কোন একটা কাজ জুটিয়ে নেও। আশা করি আমার উপদেশটা তুমি মেনে চলবে। এখন এস, এক কাপ চা খাও।

আমরা লোকের পাল্লায় পড়লাম তো। জীবনে আমি অনেক লোকের সাথে কথার প্রতিযোগী-তায় নেমেছি। কিন্তু এই রকম লোক দেখিনি কোন দিন। নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়ে

কথার প্রতিযোগীতা করে, এমন লোক জীবনে এই প্রথম দেখলাম। আমিও হেসে তাকে ধন্যবাদ দিই। ওনাকে বললাম, "ভাই আপনার উপদেশের জন্য অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার অনুরোধটা রক্ষা করতে পারছি না। আমি আপনার সাথে চা খেতে যেতে পারছি না।"
উনি বললেন, "ঠিক আছে, তুমি যা মনে কর। আমি তোমার জন্য দোয়া করছি তুমি যেন ভাল থাক।"
এই বলে উনি চলে গেলেন। আমি ঐ লোকটার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু আমার এই কৃতজ্ঞ বোধটা বেশী ক্ষণ থাকলো না। ঐ লোকটা আমার কাছ থেকে কতদূর গিয়ে আর একটা লোককে, আমার

উদ্দেশ্য করে জোরসুরে কি যেন বললেন। প্রথম ব্যক্তির (আমার সাথে যার কথা হয়েছে) কথা শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তি (আমার সাথে যার কথা হয়নি) আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। সাথে সাথেই আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম, উনি (দ্বিতীয় ব্যক্তিটি) আমাকে চিনতে পেরেছেন। আমাকে চিনেই হয়তো উনি বললেন, "আর্ট-চোর, আর্ট মাইরছে, আর যাংগা পাওনা।" ওনার কথা শুনে নিশ্চই পাবলিক মত্ত হল। আর বাংলার পাবলিকের তো আবেগটাই বেশি। তাদেরকে যা বোঝানো হয় তাই তারা বোঝেন। যদি কেউ কোনমতে তাদের বোঝাতে পারে যে, আমি আর্ট চোর। তাহলে তারা (পাবলিকরা) সহজে কিল এবং আমার পেটে, পিঠে, বুকে,

সামনে এসে পড়ল। এই ভয়ে আমি আর দাঁড়িয়ে থাকলাম না। দৌড়াতে লাগলাম, ঠিক ওনার (যিনি আমাকে ফিরে আসতে দিলেন) বিপরীতে। দৌড়ে আমি ভাল তা তো আগেই বলেছি। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। উনি আমার সাথে দৌড়িয়ে পারলেন না। দৌড়াতে দৌড়াতে যখন ভাবলাম আমি ওনার হাত থেকে মুক্ত তখন দৌড় বন্ধ করলাম। ধীর গতিতে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় দেখলাম সামনে একটা মসজিদ। তখন মসজিদে এশার আযান হচ্ছিল। ভাবলাম ঐ মসজিদে এশার নামাযটা পড়ে যাই। এই-ভেবে মসজিদের পাশের পুকুর হতে ওযুর পানি

সেরে ফেললাম। তারপর মসজিদের ভিতরে
ঢুকে পড়লাম। [illegible] যেয়ে, মস-
জিদে ঢুকে দেখলাম আমার থেকে কিছুটা
বয়সে বড়, [illegible], এমনি একটা ছেলেকে যে
মসজিদের এক কোনে বসে পবিত্র কোরআন শরীফ
পাঠ করছে। আমি কিভাবে তা কোরআন শরীফ পাঠ
করতে হয় তা জানতাম। তাই আর বিলম্ব
না করে মসজিদের তাক থেকে একটা কোর-
আন শরীফ নামিয়ে আনলাম। তারপর
আরেকটা তাক থেকে রেহাল* এনে মসজিদের
ভিতরে বসে পড়তে শুরু করে দিলাম।

* * *

(রেহাল* হলো কাঠের তৈরী জিনিস। যার
সাহায্যে কোরআন শরীফ উপরে রেখে পড়া
যায়।)

আমার জীবনের সত্য কথা

কিছুক্ষন পর একটা লোক এসে আমাকে বললেন
"এখন পড়া বন্ধ দাও।"
আমি বললাম, "কেন?"
— "এখন নামাজ হবে।"
আমি তার কথা না বাড়িয়ে কোরআন শরীফ এবং রেহাল যথাস্থানে রেখে দিলাম। তারপর আমার সাথে নামাজ পড়তে দাড়িয়ে গেলাম। যে লোকটি আমাকে কোরআন শরীফ পড়া বন্ধ করতে বলে দিলেন, সেইমাত্র তিনিই সামনে দাড়িয়ে গেলেন। আমি বুঝতে পারলাম উনিই মসজিদের ইমাম সাহেব। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে এলাম। মসজিদের পুকুরের পাড়েই ছিল একটা ইটের তৈরী বেঞ্চ। তাতে

* আমার জীবন সত্যকথা *

যেমনটি থাকে। আমি আনন্দ-বিহ্বলে কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই সেজদাতে পড়ে রইলাম। সবাইকে দেখলাম এক এক করে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন, যার যার বাড়ীর উদ্দেশ্যে। এক সময় মসজিদের ইমাম সাহেব মসজিদ থেকে বের হয়ে এলেন। তিনি আমাকে সেজদায় উপর হয়ে থাকতে দেখে বললেন, "কে এখানে?"

আমি ক্ষীণ উত্তরে বললাম, "হুজুর আমি।"

—" ও তুমি! তোমাকেই না মসজিদের ভিতরে কোরআন শরীফ পড়তে দেখেছি। তা এখানে এ করে পড়ে কেন?"

—" থাকার তো কোন জায়গা নেই, তাই।"

— " কোন কাজ করতে পার না ।"
— " কাজ করতে চাই । কিন্তু পাইনা ।"
— " তাই বলো ! যে আগে বললেই হয় ।
তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে আবার তিনি বললেন, " এখন আমার সাথে চলো । আমার বাসায় আজ রাত থাকবে । আগামীকালই তোমার একটা ব্যবস্থা করা যাবে ।"
এই বলে উনি আমাকে ওনার বাসায় নিয়ে গেলেন । তারপর একটা চকি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, " ওটাতে শুয়ে পড় ।"
আমি ওনার কথামত চকিটাতে শুয়ে পড়লাম । সাথে সাথে ঘুমিয়েও পড়লাম । না ঠিক ঘুমিয়ে পড়লাম না, ঘুমিয়ে

আমার জীবন স্মরণ

গেলাম। কোথায় যে গেলাম তা আমি নিজেও জানি না। হয়তো কোন স্বপ্নের রাজ্যেই গিয়ে ছিলাম। ফিরে এসে শুনি হুজুর আমাকে ডাকছেন। তিনি ডাকছিলেন, ফজরের নামাজ পড়ার জন্য। ওনার ডাক যখন আমার কানে পৌঁছালো, তখন স্বপ্নের জগতকে বিদায় জানিয়ে চলে এলাম বাস্তব জগতে। অর্থাৎ ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। তারপর হুজুর আর আমি রওনা দিলাম মসজিদের উদ্দেশ্যে। মসজিদের কাছে এসেই সেই-পুকুর হতে দুজনে ওজু করে নিলাম। তারপর মসজিদের ভিতর ঢুকে পড়লাম। মুসল্লিরা আগেই তার আসন পেতে রেখেছিল।

* আমার জীবনের সত্য ঘটনা *

আমরা ~~ম~~ মসজিদে পৌঁছানোর পূর্বে কিছু লোক মসজিদে সমবেত হয়ে ছিল। পৌঁছানোর পর কিছু লোক সমবেত হলো। সবার উদ্দেশ্য নামাজ পড়া। যখন নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট সময় আমাদের সামনে হাজির হলো, তখন সবাই নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম কিব-লার দিকে। নামাজ শুরু হলে আমরা সবাই মাথা নত করে বুকে হাত বাঁধিলাম। এমন ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম, যেন আল্লাহর কাছে আমরা মস্ত বড় অপরাধ করে ফেলেছি। সেই অপরাধের জন্য তার কাছে সমস্ত ভাবে আমরা মাফ চাচ্ছি। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে যখন সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম, তখন মনে হলো

আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করেননি। তাই তার পা জড়িয়ে ধরে একান্ত অনুশোচনার সাথে মাফ চাচ্ছি। নামাজের সব শেষ শুরু হলো মোনাজাতের পালা। মোনাজাত শেষে যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে এলাম, তখন মনে হলো আল্লাহ আমাদের মাফ করে দিয়েছেন। এবং আমাদের মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাই আমরা মসজিদ থেকে বের হয়ে এসেছি। আমি মসজিদের বাইরে এসে হুজুরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। হুজুর মসজিদ থেকে বের হয়ে এসে দরজায় জুতার ভেতর দিয়ে ফেললেন। তারপর জুতার ফিতাগুলো তল থেকে

পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন, "এই টাকা দিয়ে কিছু খেয়ে নিও। তারপর ঐ বন্দর রোডের কাছে গিয়ে একটা হোটেল দেখতে পাবে। সেই হোটেলে সোহরাব নামে একটা ছেলে কাজ করে। সোহরাবের কাছে আমার কথা বললে হয়তো ও তোমাকে কোন কাজ দিতে পারবে।"

আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম, "স্যার বন্দর রোডটা কি?"

— "বন্দর চেনো না। ওটি হলো সামুদ্রিক বন্দর। সেখানে জাহাজ থামে।"

—" তাই বলেন! আমি ভাবলাম কি যেন কি।"

— "যাক, আর কি যেন কি ভেবে কাজ নেই। এখন যেখানে যেতে বললাম সেখানে যাও।

* আমার জীবনের সত্য কাহিনী *

শেখ সাহেবকে কোন কাজ দিতে পারে নি।" আমিও আর কথা না বাড়িয়ে বেরুলাম। কমলাপুর ৫ নম্বর রোডের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পথে একটা হোটেল থেকে রুটি, দেওয়া ৫ টাকা দিয়ে কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর আবার চলতে শুরু করে দিলাম। শেষ পর্যন্ত অনেক হাঁটা-হাঁটির পর ৫ নম্বর রোডে পৌঁছাতে পারলাম। রোডের পাশে অনেকগুলো হোটেল দেখতে পেয়ে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমি ভুলে গেলাম যে কোন হোটেলটিতে সাহেব থাকে। তাই প্রত্যেকটি হোটেলে জিজ্ঞেস করতে লাগ-লাম এই বলে, "এখানে সাহেব নাম

কোন ছেলে কি কাজ করে ?"

অনেক খোঁজা - খুঁজির পর সোহরাব যে হোটে-লটিতে কাজ করে, সেই হোটেলটি খুঁজে পেলাম। কিন্তু সোহরাব তখনও হোটেলে এসে পোঁছায়নি। তাই তার আসার অপেক্ষায় হোটেলের চেয়ারে বসে রইলাম। কিছুক্ষন বসে থাকার পর সোহরাব হোটেলে এল। আমাকে সে চিনতে না। আর চিনবেই বা কি করে। আগে কি কখনো দেখা হয়েছে, যে, আমাকে সে চিনবে। যখন আমার কাছ থেকে ও জানতে পারলো হুজুর আমাকে পাঠিয়েছে, তখন কিছুক্ষন চিন্তা করে বললো, "এই হোটেলে তো কোন কাজ নেই। দেখি তোমার মত অন্য কোন হোটেলে কাজ

যোগাড় করতে পারি কিনা।"
এই বলে সে আমাকে নিয়ে হোটেলের বাইরে যেতে উদ্যত হলো। হোটেলের দরজার কাছে এসে ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "কিছু খেয়েছ ?"
আমি ওর উত্তরে বললাম, "খেয়েছি।"
আমার খেয়েছি কথাটা কানেও না শোনার ভান করে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললো, "এখানে বস, আমি একটু পরে আসছি।"
এই বলে সে হোটেলের দরজার ভিতর ঢুকে পড়লো। কিছুক্ষণ পর সে আমার জন্য চারটি পরোটা ও একপ্লেট ভাজি নিয়ে এল। আমি ওকে বললাম, "খামোখা, এই

খাবার আমার কোন দরকারই ছিল না।
উনি ও বললো, " এ খাবো না। তোমার এই খাবারের প্রয়োজন ছিল।"
আমি ওর সাথে আর কথা বাড়ালাম না।
খাওয়া শেষ আমাকে নিয়ে সে হোটেল থেকে বের হয়ে এল। তারপর একের পর এক হোটেলে জিজ্ঞেস করতে লাগল আমার কাজের জন্য।
কিন্তু কোন হোটেলে কাজ পাওয়া গেল না।
আমি তখন সোহরাবকে বললাম, " ভাই তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছ। আর না, এখন আমি নিজে চেষ্টা করে দেখি কোন কাজ খুঁজে পাই কিনা।"
ও বললো, " সে কি! ^এখনই যাবে কেন? ইচ্ছে যখন তোমাকে

পারিয়েছে, তখন তোমার একটা উপকার তো করতেই হবে।"

—"তুমি আমার যত উপকার তো করার চেষ্টা করেছ। এটাই যথেষ্ট।"

—"না, এটাই যথেষ্ট না। তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি।"

আমি দেখলাম, ও আর আমার কথায় আসবে না। তখন ওর কাছ থেকে জোর করে বিদায় নিলাম। এ জন্য ও খুব মন মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে।

সাইকাতের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর এসে পড় এক হোটেল থেকে সুরু করে মুদির দোকান, যন্ত্রপাতির দোকান, ওয়ার্ক-

শুর, ঘড়ির দোকান ইত্যাদি যাবতীয় দোকানে কাজ খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও কোন কাজ পেলাম না। কাজ খুঁজতে খুঁজতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। তবুও কোন কাজ খুঁজে পেলাম না। আরও কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর, যখন রাত্র হয়ে এলো, তখন কাজ খোঁজা বাদ দিলাম। খুঁজতে লাগলাম সত-কালের সেই মসজিদটি। অনেকক্ষণ ঘোরা-ঘুরির পর মসজিদটিকে খুঁজে পেলাম। তারপর মসজিদের কাছের সেই পুকুরটি হতে ওজু করে মসজিদের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর মুয়াজ্জিন এশার আযান দিলেন। আযান শেষে মসজিদে যে কয়জন

যোগ দিলাম, তারা সেখানকার সব খেত কাটলাম। কিছুক্ষণ পর ইমাম সাহেব মসজিদের ভিতরে ঢুকলেন। আমাকে দেখে ডেকে নিয়ে গেলেন মসজিদের এক পাশে। তারপর চারপাশ ফিরে ফিরে দেখে বললেন, "সাহেব কি কোন খবর দিতে পারেনি?"

— "তার কোন দোষ নেই। সে অনেক খোঁজা-খুঁজি করেছে। কিন্তু কোন খোঁজ পায়নি।"

— "আচ্ছা, এখন নামাজ পড়। নামাজ শেষে দেখা যাবে।"

এই বলে তিনি সব লোকের সামনে দাঁড়িয়ে

* আমার জীবনের সত্যকথা *

গেলেন নামাজ পড়ানোর জন্যে। আমরা সবাই ওনার পিছনে সারিবদ্ধ-ভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম। নামাজ শেষে ইমাম সাহেব আমাদের উদ্দেশ্য করে মসজিদের সব লোকদের বললেন, " এই ছেলেটার আর কেউ নাই। কিন্তু কোন কাজ খুঁজে পাচ্ছে না। আপনারা যদি ওকে একটা কাজের সন্ধান করে দিতে পারেন, তাহলে আমি খুব খুশি হতাম।" হুজুরের মুখে এই কথা শোনা মাত্রই একটা লোক বলে উঠলো, " আমি এই ছেলেটাকে একটা হোটেলের কাজ দিতে পারবো।" হুজুর বললেন, " ঠিক আছে, আপনাকেই ওর-

তেই চলবে।"
তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে আমার উনি (হুজুর) বললেন, "যাও ওনার সাথে।"
আমি হুজুরের অনুমতি পেয়ে ঐ লোকটার সাথে রওনা হলাম। মসজিদের একেবারে নিকটেই ছিলো হোটেলটি। হোটেলে বসে ছিলেন একজন বুড়ো গোছের মানুষ। আমাকে যে লোকটা নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি হোটেলের ঐ বুড়ো লোকটাকে বললেন, "চাচা, একদিন আপনি বলেছিলেন যে, আপনার একটা কাজের লোকের দরকার। তাই-এই ছেলেটিকে নিয়ে এসেছি।"
বুড়ো লোকটি বললেন, "এসেছেন! এসে ভালই

* আমার জীবন সংগ্রাম *

করেছেন।"

তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি (বুড়ো লোকটি) বললেন, "এর আগে কোন হোটেল কি কাজ করেছ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ করেছি।"

– "কোন হোটেলে?"

–"হালি শহরের একটা হোটেল।"

– "ঠিক আছে। তোমাকে আমার হোটেল কাজে নিলাম। প্রতি মাসে বেতন পাবে ৩০০ টাকা। আর খাবার দিব।"

আমি ওনার কথায় রাজী হয়ে গেলাম। যে লোকটা আমাকে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি কিছুক্ষণ পর চলে গেলেন।

* আমার জীবনের সত্যকথা *

আমি ঐ হোটেলে ঠাঁই পেলাম। ধীরে ধীরে হোটেলের কাজও শুরু করে দিলাম। প্রথম প্রথম নতুন জায়গায় কাজ করতে আমার যেন কেমন লাগছিল। অবশ্য কিছুদিন কাজ করার পর তা ঠিক হয়ে গেল।

হোটেল ওয়ালার তিন ছেলে। আর তিন ছেলেই হোটেলে কাজ করে। তারা প্রত্যেকেই আমার চেয়ে বয়সে বড়। তিনজনে দুইজন করতো রান্না কাজ। আর একজন করতো টেবিলের কাজ। হোটেল ওয়ালা নিজে করতেন হিসেবের কাজ। পূর্বের হোটেলে যে কাজ ছিল আমারও সেই কাজ দেওয়া হলো। অর্থাৎ টেবিলের

কাম। তাহারাও আমার কাছে হতো খাল-
নর্দমা পরিষ্কার, পুকুর থেকে পানি আনা,
টিউব ওয়েল থেকে পানি আনা ইত্যাদি।

এখানকার সব হোটেলের খাবার
পানি নিকটবর্তী একটা টিউব ওয়েল থেকে
কিনে আনতে হতো। আমি যে হোটেলে
কাজ করতাম সেই হোটেলওয়ালা ছিল
প্রকৃত চালাক-চতুর লোক। তিনি পুকু-
রের পানি আর টিউব ওয়েলের পানি
একত্রিত করে মানুষকে খাওয়াতেন।
এটা তার অন্যায় হলেও কিছু বলা যেতো
কিন্তু তিনি কি মানতেন তার এই অন্যায়

আমার জীবন সত্যকথা

কারণ পয়সা লাভের জন্য যত লোকের এত মানুষকে মারা হচ্ছে। হয়তো জেনে শুনেই তিনি এই কাজে হাত দিয়ে ছিলেন। অথচ অজ্ঞতার জন্য মানুষ জানেনা দূষিত পানি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আমি কিছু বুঝতে পেরেছিলাম তিনি জেনে শুনেই এই কাজে হাত দিয়েছেন। কেননা তিনি কোন সময়ে খাবার পানি খেতেন না। আমি ওদের এই কাণ্ডটি সহজ ভাবে মেনে নিতে পারলাম না। তবুও প্রচণ্ড কষ্ট হলেও সব কিছু সহ্য করতে হতো।

প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠতাম। সকালে

আমাদেরও আগে । ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ না ধুয়েই হোটেলের প্রাথমিক কাজ করতে হতো । যেমন :- হোটেল পরিষ্কার করা, মাল-রসুন পরিষ্কার করা ইত্যাদি । যখন কাজ করতে করতে সকাল হয়ে যেত, তখন কয়লা দিয়ে দাঁত মেজে পুকুর থেকে হাত-মুখ ~~ধুয়ে~~ পরিষ্কার করতাম । তারপর আবার হোটেলে এসে হোটেলের কাজ শুরু করে দিতাম । সকালের নাস্তার সময় আমাদের দেওয়া হতো চার-পাঁচটা রুটি আর ভাজি । খাওয়া-দাওয়ার পর পুনরায় দুপুর ১টা–২টা পর্যন্ত কাজ করতে হতো।

দুপুরে খাবার আমার উপর ভার দিল, দুই মুঠো ভাত তার সাথে অন্য দু একটা তরকারি। কোনো দিনই আমার জন্য ভর্তা শাক-সবজী।

যদি হোটেলের খাবার আমি খাইতে তো তাহলে প্রত্যহ আমাদের টিউব ওয়েলের পানি দিলে আমার মন খারাপ হতো। আমার খারাপ হতো মুখের স্বাদ-পানি আমার মন। এ দুটো ব্যাপার আমি একত্রিত করে হোটেলের খাদিমদের খাও- য়ানো হতো। হোটেলের উপলক্ষ একটু দয়া ছিল। তিনি এই নিশ্চিত পানিতে সুস্বাদে,

আমার জীবনের সত্যকথা

পানি বেশী দিলে ও তাতে ফিটকারী দিয়ে পানি বিশুদ্ধ করার একটা চেষ্টা করলেন। কিছুদিন ফিটকারী দেয়ার পর যখন দেখলেন এতে তার খরচ বেশী হচ্ছে, তখন উনি ফিটকারী দেওয়া বন্ধ দিলেন।

একদিন হোটেল ওয়ালার বড় ছেলে আমাকে বললো, "মাছ ধরতে যাবি?" আমি বললাম, "কোথায়?"

— "কেন, সমুদ্রে।"

— "সমুদ্র কোথায়।"

— "বেশী দূরে নয়। এখান থেকে ১ মাইল দূরে।"

— "যাব।"

—"তাহলে চল।"
এই বলে সে হোটেলের ভিতর থেকে একটা পেন্নি* নিয়ে এল। তারপর বললো, "চল।"
আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "মাছ দিয়ে বাঁধবে কিসে?"
সে বললো, "বন্ধু, ভুলে গেছি। তুই এখানে দাঁড়া আমি একটা কুড়ি আনছি।"
এই বলে সে আবার হোটেলের ভিতর প্রবেশ করল। তারপর একটা কুড়ি হাতে নিয়ে বের হয়ে এল। সব প্রস্তুতি শেষ হলে আমরা

—x——x—

পেন্নি* হলো এক ধরনের জাল। যার চারপাশে কাঁটা বেড়া থাকে। পানির ভিতরে ঢুকিয়ে টেনে নিতে হয় মাছ ধরার জন্য।

মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

প্রায় ১মাইল মতো হেঁটে আমরা সমুদ্র দেখতে পেলাম। জীবনে এই আমি প্রথম সচক্ষে সমুদ্র দেখতে পেলাম। তাই সমুদ্র দেখার সাথে সাথে আমার মনটা দুলে উঠলো। আমরা আস্তে আস্তে সমুদ্রের কাছে অগ্রসর হতে লাগলাম। এক সময়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে নেমে পড়লাম।

তখন সমুদ্রে ভাঁটা ছিল। হোটেল-ওয়ালার বড় ছেলে জিল্লুমান মাছ ধরতে ধরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। এক সময় আমার হাতে জালটি দিয়ে বললো, "তুই মাছ ধর, আমি একটু জিড়িয়ে নেই।"

— "ঠিক আছে।"

তারপর থেকে আমিই মাছ ধরতে শুরু করে দিলাম। জেলিটা অনেকখানি দিয়ে সমুদ্রের কূলের পানিতে টানলাম। তারপর পানি থেকে উঠিয়ে আনলাম উপরে। কখন এতখানে যে মাছ জেলি জালে জড়িয়েছে তা বেছে শেষ নেয়ার নয়। উপরে উঠতেই জেলির ভিতরে দেখতে পেলাম একটা সাপ। আমি আর আগা-গোড়া চিন্তা ভাবনা না করে দিলাম এক দৌড়। তারপর হোটেল ওয়ালার বড় ছেলেকে বললাম, "জেলিতে সাপ উঠেছে"। সে আমাকে বললো, "সাপ উঠেছে তো কি হয়েছে। তাই বলে দৌড়ে

পালাতে হয় নাকি"।
এই বলে সে এক দৌড়ে গেন্নিটার কাছে গেল। আমি তার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলাম। গেন্নির কাছে গিয়ে সে গেন্নিটা আস্তে করে মাথায় তুললো। ফলে সাপটা আস্তে আস্তে গেন্নি থেকে বের হয়ে গেল।

সেদিনকার মতো সাগর ঘুরা এই পর্যন্তই ইতি করলাম। চলে এলাম হোটেলে। পুকুর থেকে গোসল করে কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর বিশ্রাম নিয়ে আমার হোটেলের কাজ শুরু করে দিলাম।

হোটেলের পাশেই ছিলো নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তাই হোটেলের বেশীর ভাগ লোকই আস-

ছেন নাকি। ওনারা হোটেলে বসে খাবার-খাওয়ার সাথে সাথে হরেক রকম আলাপ করতেন। ওদের আলাপ থেকে জানতে পারলাম যে, ওদের মধ্যে কেউ কেউ জাহাজ চালাচ্ছে আর কেউ কেউ জাহাজ চালানো শিখছে।

হোটেলের কোন লোক কোন দিন আমার মা-বাবা আছে কিনা বা আমার বাড়ি কোথায় এর কোন কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। আমিও নিজে থেকে কিছু বলতে যাইনি। একদিন মাত্র হোটেল-ওয়ালা বলেছিলেন, "হ্যারে তোর কি মা-বাপ বেঁচে আছে?"

প্রশ্নটা শুনেই আমার পিলে চমকে গেলো।

কারন এখন যদি আমি বলি যে, আমার মা-বাবা বেঁচে আছে। তাহলে উনি আরও হয়তো প্রশ্ন করবেন। আমার তখন সব সত্য কথাই বলতে হবে। কেননা আমি প্রতিজ্ঞা করেছি সবসময় সত্য কথা বলবো। তখন মনে মনে বললাম," যা থাকে কপালে। সত্য কথাই বলবো।"
আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি আমায় বলে উঠলেন," কিরে, চুপ করে আছিস কেন? তোর মা-বাবা কি বেঁচে নেই?"
আমি তখন ঝট করে বলে ফেললাম," হ্যা আছে।"
আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, উনি আমার উত্তর শোনা মাত্র চুপ করে গেলেন।

আমাকে আর কোন প্রশ্নই করলেন না। হয়তো উনি বুঝতে পেরেছেন মা-বাবা যখন বেঁচে আছে তখন দরিদ্রতার জন্যই আমি ঘর থেকে বের হয়েছি। আমি আর ওনার সামনে দাঁড়িয়ে না থেকে নিজের কাজ কাজ শুরু করে দিলাম। নিজের কাজ ঠিক মত। পরে কাজ নিজ হাতে করা।

এই হোটেলে ১০ দিন কাজ করলাম ভাল ভাবেই। আমার কাজ দেখে হোটেল ওয়ালা খুবই খুশী হলেন। এতই খুশী হলেন যে, খুশীর চোটে তিনি বলেই ফেললেন, "তোমাকে আরও ১০০ টাকা বেশী, অর্থাৎ ৪০০ টাকা বেতন দেওয়া হবে।"

ওনার কথায় আমিও খুব খুশী হলাম। তখন আমি আবার দ্বিগুন উৎসাহে কাজ শুরু করে দিলাম। কিন্তু হোটেলওয়ালা বেশী দিন আমার প্রতি খুশী হয়ে থাকতে পারলেন না। একটা ঘটনার পর তিনি আমার প্রতি অখুশী হয়ে গেলেন। সেই ঘটনাটিই এবার আপনাদের কৌতূহল দূর করার জন্য উল্লেখ করছি।

একদিন একজন খরিদ্দারের সাথে ঝগড়া পাকালাম, ওদের ভিষন জোট বাধা করছে। তখন উনি খাবার খাচ্ছিলেন। খাবারের প্লেট ছেড়ে দিয়েই চলে গেলেন উনার জায়গায়। আর কেউ না বুঝুক হোটেলের লোকে, অর্থ্যাৎ

আমরা ঠিকই বুঝেছিলাম যে কারনে নাবিকটার পেট খারাপ করছিলো। আমাদের হোটেলের খারাপ পানি খাওয়ার দরুন ওনার এই অবস্থা হয়েছে। আমার কিন্তু লোকটার জন্য খুবই কষ্ট হচ্ছিল। (আল্লাহ্ না করুন) অবস্থা যদি খারাপের দিকে মোড় নেয়, তাহলে তো তার জন্যে আমরাই দায়ী। দোষটা হয়তো আমারই বেশী। কেননা, আমি ব্যাপারটা জেনেও সব লোককে হুশিয়ার করে দেইনি। সবাইকে বলে দেইনি যে, এই হোটেলের খাবার পানি খারাপ। হোটেল ওয়ালা ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করলেন। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে

ধমকের সুরে উনি বলে উঠলেন," কিরে দাড়িয়ে আছিস কেন ? কাজ কর ।"
আমি আর দাড়িয়ে না থেকে কাজ করতে লাগলাম ।

আরেকদিন অন্য আরেকজন নাবিক হোটেলওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, " চাচা, আপনার হোটেলের পানি যেন কি রকম । অন্য হোটেলের পানির স্বাদ এক রকম, আর আপনার হোটেলের পানির স্বাদ অন্য রকমের । ব্যাপার কি বলুনতো।" হোটেলওয়ালা ওনার কথার উত্তরে বললেন ," কি করব বাবু । আজকাল টিউবওয়েলের পানিও খারাপ হয়ে গেছে ।"

হোটেল ওয়ালার এই মিথ্যা কথা শুনে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। তখন ওনার এই মিথ্যা কথার প্রতিবাদ জানিয়ে সবার উদ্দেশ্যে বলে উঠলাম, " উনি মিথ্যা কথা বলছেন। আপনারা জানেন না, আপনাদের এই হোটেলে কিসের পানি খাওয়ানো হয়। আপনারা এই হোটেলে পুকুরের পানি খেতে পান।" আমার এই কথা শোনা মাত্র সব লোক উঠে দাঁড়ালেন। একজন পাকিস্তানি হোটেল ওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, " চাচা, আপনাকে আমরা বিশ্বাস করতাম। তাই এই হোটেলে খেতে আসতাম। তার আপনি আমাদের মাথায় হাত-

আসবেন।

হোটেলওয়ালা বললেন, "আমি কিছু জানিনা। আর ঐ ছেলেকেই জিজ্ঞেস করেন। ওই হয়তো আপনাদের পুকুর হতে পানি খাওয়াচ্ছে। কারন পুকুর টিউব- ওয়েল থেকে কাছে। অন্য এত্তালোর মত ও হয়তো তাই পুকুর হতে পানি এনে আপনাদের খাওয়াতো।"

আমি এই কথার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, "মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা। আমি পুকুর থেকে পানি এনে খাওয়াবো কেন। আর আমি যদি পুকুরের পানি আপনাদের খাওয়াতামই তাহলে এই কথা আপনাদের বলে দিতাম না।"

আমার এই কথা সবাই বিশ্বাস করলেন। তখন একটা লোক বললেন, " চাচা আপনি বুড়ো মানুষ তাই আপনাকে কিছু বললাম না। কিন্তু আমরা কেউ আর আপনার হোটেলে খাব না।"

কথাটা উনি হোটেলওলাকে উদ্দেশ্য করে বললেন। এই কথা শোনা মাত্রই হোটেলওলা সবার সামনে হাত জোড়া করে দাড়ালেন। তারপর বললেন, " বাবারা আমার খুব অন্যায় হয়েছে, আমি স্বিকার করছি আমার খুব অন্যায় হয়েছে। আমি লোভে পড়েই এই কাজ করেছি। আমাকে তোমরা মাপ করে দাও। জীবনে আর এমন কাজ করব না।"

ওনার এই অনুরোধ উপেক্ষা করেই সবাই হোটেল থেকে বের হতে লাগল। একজন লোক তো বলেই উঠলেন, "যে সময়ে অন্যায় করছ সে সময়ে মনে ছিল না।"
আরেকজন বললেন, "যাও, নিজে তো লাভ করবেই। তার উপর আবার ডাক্তারকেও লাভবান করাবে। আমাদের পুকুরের পানি খাইয়ে নিজে লাভবান হবে। পুকুরের পানি খাওয়ার ফলে আমাদের রোগ হবে। যার ফলে ডাক্তার লাভ-বান হবে। মাঝখান থেকে লোকসান যাবে আমাদের।"
এইরূপে আরও অনেকে নানা রকম বিদ্রূপ করতে লাগল। তখন একজন নাবিক বল—

লেন," তোমরা চুপ কর। চাচা নিজে থেকে যখন আমাদের কাছে মাপ চেয়েছেন, তখন আমাদের আর ওনার উপর রাগ করা চলে না। এস আমরা সবাই চাচাকে মাপ করে দেই।"

আরও কয়েকজন লোক ওনার এই কথাটিতে সমর্থন করলো। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে চাচাকে মাফ করে দিলেন। তখন চাচা আর দেরী না করে পুকুরের যত পানি ছিল, তা সব খোটেলের পিছনের নর্দমায় ফেলে দিতে বললেন। তারপর আমার হাতে কলস দিয়ে বললেন," যা জলদি টিউব-ওয়েল থেকে পানি কিনে আন।"

ওনার এই কথা শুনে আমি খুব খুশী হলাম। ভাবলাম উনি অতি অতিই ওনার নিজ ভুল বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু ওনার মনের ভিতরে যে কি ছিল, তা আমি জানতে পারলাম না। সরল মনেই ওনার সব কথা মেনে যেতে লাগলাম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠলাম প্রতি দিনের চেয়ে আরও সকালে। হোটেলের প্রাথমিক কাজ করার পর যখন সূর্য্য পূর্ব আকাশে উঁকি দিল, তখন কয়লা দিয়ে দাত-~~মুখ পরিষ্কার~~ করলাম × থেকে মাজলাম। তারপর পুকুর হতে হাত-মুখ পরিষ্কার করলাম। কারও স্মরণ

করে দিলাম প্রতিদিনের মতো। কাজ করতে করতে সকাল যখন ৮টা বাজল তখন হোটেলওয়ালা আমাকে বললেন, " তোমার কাজ আমার পছন্দ হচ্ছে না। তুমি আমার বরং আমার হোটেল থেকে চলে যাও।"
ওনার কথাগুলো মিছরীর ছুরির মতো আমার বুকে এসে বিঁধলো। আমি ওনাকে বললাম, " একদিন তো আপনি বলেছিলেন, আমার কাজ খুব ভাল। যার জন্য আপনি আমাকে ১০০ টাকা বেশীও দিতে চাইলেন। এখন আবার বলছেন আমার কাজ আপনার পছন্দ হচ্ছে না। এ কোন ধরনের কথা?"

— " তখন তোমার কাজ ভাল ছিল। এখন তোমার কাজ খারাপ হয়ে গেছে।"

— " এ আপনি কি বলছেন ? আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? আমি জানতাম একটা লোকের কাজ প্রথমে খারাপ থাকে তারপর আস্তে আস্তে ভাল হয়। আমার বেলায় কি ঠিক তার বীপরীত হলো ?"

— " তুমি আর কথা বাড়িও না। এই নাও পঞ্চাশ টাকা। টাকা নিয়ে সোজা তোমার পথ তুমি দেখ। আর কোন খাবার সময় হোটেল থেকে নাস্তা খেয়ে যেও।"

আমি বুঝতে পারলাম কেন উনি আমাকে

হোটেল থেকে বিতাড়িত করেছেন। তবুও আমি উনার প্রতি খুশী হলাম। কারণ উনি বলেছেন যে, যাবার সময় আমি যেন নাস্তা খেয়ে যাই। আমি আর উনার সাথে কথা বাড়ালাম না। উনার কাছ থেকে পঞ্চাশটি টাকা নিলাম। তারপর হোটেল থেকে ও নাস্তা খেয়ে কিছু-দিনের স্মৃতি বিজড়িত এই হোটেল থেকে বিদায় নিলাম।

কিছুদূর যাবার পর ভাবলাম, কুকুরের কাছে কি একেবারে যাব? আবার পরক্ষণেই ভাবলাম কুকুরকে আদর

বিরক্ত করেছি আর না। এখন আবার জায়গা বদল করতে হবে। এই ভেবে আবার চলে এলাম পাহাড়পুর রেল স্টেশনে। সেখান থেকে ঢাকাগামী একটা ট্রেনের ছাদে উঠে বসলাম। কিছুক্ষন পরই ট্রেন ছেড়ে দিল।

আস্তে আস্তে ট্রেনের গতি বাড়তে লাগল। এক সময় দেখলাম ট্রেন দ্রুত গতিতে চট্টগ্রামকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। আমি শেষ বারের মত চট্টগ্রামের সৌন্দর্য ভাল ভাবে দেখে নিলাম।

রাত ১০টার সময় ট্রেনটি ঢাকায় পৌঁছাল। আমি আর সামনের দিকে গেলাম

না। টঙ্গিতেই নেমে পড়লাম। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম আর মাত্র ৩০ টা টাকা রয়েছে। বাকী ২০ টাকা খাওয়ার জন্য ব্যয় হয়েছে। আমি আর টাকার কথা চিন্তা করলাম না। চিন্তা করতে লাগলাম, কোথায় ঘুমাবার মত কিভাবে একটা জায়গা পাওয়া যায়। আমি দেখলাম চিন্তায় কোন কাজ হবে না, আমাকে চেষ্টা করতে হবে। তাই আমি চেষ্টা করে দেখতে লাগলাম কোন জায়গা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু আমার চেষ্টাই বৃথা হলো। সেখানে এত পরিমান লোক জড়য়েছিল যে, তাতে তিল ধারনের স্থান হয়তো হতে পারে কিন্তু

মানুষ বাঁচার স্থান কোথাও নেই। অনেক কষ্ট করার পর একটা জায়গা পেলাম, যার উপরে খোলা আকাশ। অর্থাৎ তাতে কোন ছাউনি ছিল না। তবুও এই রকম একটা জায়গা পেয়েছি এটাও তাই ভাগ্য। আমি আর দেরী না করে গায়ের গামছা খানি দিয়ে ধুলো-বালি সরিয়ে ফেললাম। তারপর গামছাটা পেতে তার উপর শুয়ে ফেললাম। পিঠের নিচের উঁচু অংশগুলো আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছিল। কারণ আমার শোবার জায়গাটা ছিল অসমান। তবুও বাধ্য হয়ে কষ্ট করতেই হবে। কেননা এর চাইতে ভাল জায়গা খালী নাই।

আকাশে তখন অসংখ্য তারা উঠেছিল। আমি এক দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে রইলাম। আমার মনটা কষ্টদায়ক হলেও, আকাশের পানে চেয়ে আমার মনটা একটু স্বস্তি পেল। আকাশের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কখন নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়লাম, তা টেরও পেলাম না।

ঘুম থেকে উঠলাম খুব সকালে। তারপর হাত-মুখ পরিষ্কার করে নিলাম। কিছুক্ষণ স্টেশনে বসে থাকার পর যখন মনে করলাম এখন দোকান-পাট খোলা শুরু করেছে তখন স্টেশন থেকে বের হলাম। উদ্দেশ্য কোন কাজ পাওয়া।

কিন্তু ভাগ্য আমার প্রতি নির্দয় হলো। কোন কাজ খুজে পেলাম না। এমনকি দুই দিন খোজা-খুজির পর ও কোন কাজ আমার হাতে এল না। পকেট তখন আমার একে-বারে শূন্য। এই দুই-দিনে খাওয়ার জন্য ৩০ টাকা খোয়া গেছে। আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম। এখন কি করা যায়? ভাবনাটা জোর করেই মাথা থেকে সরিয়ে ফেললাম। কেননা এখন আমার ভাবার সময় নেই। আমাকে যে করেই হোক একটা কাজ খুঁজে বের করতেই হবে। এই-ভেবে আবার কাজ খোঁজা শুরু করে

দিলাম। কিন্তু রাত ৮টা পর্যন্ত কাম খুঁজেও কোন কাম পেলাম না। তখন ভগ্ন প্রায় মন নিয়ে ষ্টেশনে চলে এলাম। আমার ভাগ্য ভাল ষ্টেশনের আমার সাথে সাথে ঘুমানো রব একটা সুন্দর যায়গা পেয়ে গেলাম। সুন্দর যায়গা মানে আপনারাই-তো বুঝতে পারছেন। আমি তার সময় নষ্ট করলাম না। সাথের গামছাখানা বিছিয়ে তার উপর শুয়ে পড়লাম। জায়গাটা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি-ই করলাম। কারন দেরী করলে হয়তো যায়গাটা অন্য কোন লোকে দখল করে নেয়। আর একবার যদি তার যায়গাটা দখল করতে

পারে তাহলে তা আর সহজে ছাড়বে না।
এই স্টেশনে জায়গা পেতে হলে সন্ধ্যা থেকে
চেষ্টা করতে হয়। আর ভাগ্য ভাল তাই জায়-
গাটা পেতে বেশী কষ্ট করতে হয়নি।
তাও যদি হেলায় নষ্ট করি, তাহলে আর
কোন উপায় থাকবে না। ভাল জায়গা
পেয়ে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে
গেলাম।

ঘুম থেকে উঠে স্টেশনের পাশের সেই
কল থেকে হাত-মুখ পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে
বের হলাম। হাত-মুখ পরিষ্কার করে
স্টেশনের ভিতরে একটা বেঞ্চিতে এসে বস-
লাম। কিছুক্ষন পর দেখলাম একটা ট্রেন

এসে স্টেশনে থামলো। ট্রেনটি থামার সাথে সাথে অনেক লোক ছুটে দৌড়ালো ট্রেনটিতে ওঠার জন্য। তাদের অনেকের হাতেই ছিল দড়ি। আমি জানতাম তারা এই দড়ি দিয়ে কি করত। তারা শিয়ালদহ অঞ্চলে গোবিন্দপুর, মধুপুর প্রভৃতি জঙ্গল এলাকায় গিয়ে খড়ি বা জ্বালানী-কাঠ সংগ্রহ করে। তারপর তা বিক্রী করার পর যে দুই-চার পয়সা তাদের আয় হয়, তাতে তাদের মোটা-মুটি ভাবে খাওয়া খাদ্যটা চলে। আমি ঠিক করলাম আমিও ওদের সাথে যাব। মনে মনে এই ঠিক করে আমি ট্রেনের ছাদে উঠে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর ট্রেনটি ছেড়ে দিল।

এক সময় ট্রেনটি জঙ্গল বন এলাকায় ঢুকে পড়লো। চারিদিকে চেয়ে দেখলাম শুধু গাছ ~~গাছ~~ আর গাছ। গাছকে আমি চিরকালই ভালবাসতাম। তাই এত ঘন গাছ দেখে আমার খুব ভাল লাগল। মনে মনে ঠিক করলাম আমিও এ দেশকে গাছ গাছে ভরে তোলার একটা নতুন সংকল্প নেব। আমি জঙ্গলের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এক সময় অনুভব করলাম ট্রেনের গতি আস্তে হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম ট্রেন এখন থামবে।

যখন ট্রেন রামেন্দ্রপুর থামলো, তখন অনেকেই ট্রেন হতে নেমে পড়তে লাগ-

লেন। তাদের ভিতরে যারা ঘড়ি নিতে এসে-ছেন তারাও আছেন। আমি আর বিলম্ব করলাম না। ওনাদের (যারা ঘড়ি নিতে এসেছেন) পথ অনুসরণ করে নেমে পড়-লাম। নেমেই দেখতে পেলাম, পাঁচটি আমার বয়সি ছেলে ঘড়ি হাতে নিয়ে রাম-পুকুর খাল পাড়ের ভিতরে ঢুকছে। আমি আর বিলম্ব না করে ওদের পিছন পিছন চলতে লাগলাম। আমি যে ওদের ~~পিছু~~ পিছন পিছন চলছি তা ওরা টের পেল না। অনেকক্ষণ পর আমি ওদের সামনে পড়লাম। তখন একটা ছেলে আমাকে প্রশ্ন করলো, "তুমি যাবে কোথায়?"

আমি উত্তর দিলাম, " তোমরা যেখানে যাচ্ছ, সেখানে । "

-- " আমরা তো যাচ্ছি খড়ি আনতে । "

-" আমিও যাচ্ছি সেখানে । "

-" কিন্তু তোমার দাড়ি কৈ ? "

-" দড়ি নাই । "

-" তবে কি করে খড়ি নেবে । "

-" কেন, কলাগাছের কোৎকা* দিয়া । "

—*—*—

কোৎকা* হল কলাগাছের একটা অংশ । যার সাহায্যে দড়ির কাজ করা যায় ।

_ "তাহলে তুমি আমাদের সাথে যেতে পার"।
আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। পেটে তখন প্রচন্ড খিদে। খিদেকে সরিয়ে দিলাম দূরে, কষ্টকে নিয়ে এলাম কাছে। অর্থাৎ আমি কষ্ট সহ্য করেই পথ চলতে লাগলাম। এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ের দরজা আমার জন্য খোলা ছিল না। মনকে সান্ত্বনা দিলাম এই বলে যে, যদি ঘড়ি নিয়ে বিক্রী করতে পারি তাহলে সেই টাকা দিয়ে কিছু কিনে খেতে পারবো। আমার মনে সন্দেহ ছিল, ঘড়ি নিয়ে বাইরে বিক্রী করতে পারবো কিনা।

আমি এদের দলে আসায় মোট-

উপরন্তু হলাম। দুর্যটি ছেলে প্রায় একই বয়সের। কিন্তু কারও সাথে এর আগে আমার পরিচয় হয়নি। ওদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, ওরা আরও অনেকবার এই বনে খড়ি নিতে এসেছে। কিন্তু আমি এলাম জীবনে এই প্রথম। তাই এত গভীর বন দেখে আমার ভয় ভয় করতে লাগল। ওদের দিকে চেয়ে দেখলাম, ওরা নির্বিঘ্নে হেঁটে যাচ্ছে। তাই আমার ভয়ও কিছুটা কমে গেল। বনে শাল গাছগুলো এত ঘন হয়ে জন্মেছে যে, দিন হওয়া সত্ত্বেও সব-কিছু ভাল-ভাবে দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ধান খেতের উপরে খোলা আকাশ

থাকায় সেখানেই মাত্র সূর্যের আলো এসে পড়ে। ওদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ধান ক্ষেতের জমিগুলো এখানকার স্থানীয় লোকদের। অর্থাৎ এই বনে যে স্বল্প কয়জন লোক বাস করে তাদের। আমি ও আমার সাথের ছেলেরা বনের ভিতরের সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটছি আর আমি ওদেরকে নানা রকম প্রশ্ন করে ক্লান্তি ভ্রান্ত করছি। রাস্তার (সরু পথ) দুই পাশেও ছিল উঁচু উঁচু শালগাছ। কিছুদূর হাঁটার পর এখানকার স্থানীয় লোকদের লাগানো একটা কলাগাছ হতে কিছু কোয়া ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর আবার চলতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর ওরা খড়ি সংগ্রহ করতে লেগে গেল। ক্ষেতে যে সব ক্ষাল গাছের ডাল-পালা পড়ে আছে, অথবা কোন লোক গাছ কেটে শুধু কান্ডটা নিয়ে গেছে আর ডালপালা রেখে গেছে, আমরা এমনি সব খড়ি যোগাড় করতে লাগলাম। আমার পেটের অবস্থা তখন শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। আমি আর ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে পারছিলাম না। তবুও অনেক কষ্ট করে সহ্য করতে লাগলাম। কিছু-ক্ষণ পর ক্ষুধার জ্বালায় আমার মাথা ঘুরাতে লাগল। তখন আখের ছোবড়া

উদ্দেশ্য করে বললাম, " আমার খুব খিদে লেগেছে । এখন উপায় কি ?"
একটা ছেলে বললো, " কি আর করবে, সহ্য করে যাও ।"
—" সহ্য যে আর করতে পারছি না ।"
—" সত্যিই কি তোমার খুব খিদে লেগেছে ?"
—" হ্যাঁ সত্যিই খুব খিদে লেগেছে ।"
—" তাহলে তুমি খাতি খোঁজা বন্দ দাও । দেখ ধারে কাছে কোথাও ঘর-বাড়ি পাও কিনা । এখানকার লোক-জন খুবই ভাল । তুমি তোমার সমস্যার কথা বললে তারা নিশ্চই তোমাকে কিছু খেতে দেবে।"
এই বলে সে আমাকে একটা পথ দেখিয়ে

দিল। আমি আর দেরী না করে সে পথে রওনা দিলাম।

আমি হাঁটছি তো হাঁটছিই। কিন্তু কোথাও কোন ঘর-বাড়ি দেখতে পেলাম না। শুধু গাছ আর গাছ। গাছ আমার কাছে এত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও এই সময়ে সে আমার কাছে অপ্রিয় হয়ে গেল। কারন হলো আমার পেটে এখন প্রচণ্ড ক্ষিদে। আমার মনে পড়ে গেল উইলিয়ম মি ব্রাউনের একটি উক্তির কথা। তিনি বলেছেন, " খালি পেটে কেউ কোন দিন স্বদেশ প্রেমিক হতে পারে না "। আমার মতে বাক্যটা এভাবে প্রযোজ্য, " খালি পেটে কেউ

কোন দিন সৌন্দর্য্য প্রিয় হতে পারে না।"
আনুমানিক এক মাইল মত হাঁটার পর দূরে
বাড়ির মত কিছু একটা দেখতে পেলাম।
আর কিছুদূর যেতেই সত্যি সত্যি আমি বুঝতে
পারলাম ওটা একটা বাড়ি। মরে যাওয়ার
পর আমি আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছি,
এমনিভাবে লাফিয়ে উঠলাম। আরও জোরে
জোরে পা চালিয়ে, বলতে গেলে এক-
রকম দৌড়াতে দৌড়াতেই বাড়িটার কাছে
গেলাম। বাড়ির সামনে দেখতে পেলাম
একটা টিউব-ওয়েল। আমি তাড়াতাড়ি
করে টিউব-ওয়েল থেকে কিছু পানি খেয়ে
নিলাম। খালি পেটে পানি খাওয়ার দরুন

মাথাটা আরও বেশী ব্যাথা করতে লাগল। আমার বয়সি একটা ছেলেকে দেখতে পেলাম, বাড়ির সামনে একটা গাছ তলায় দাড়িয়ে আছে। আমাকে দেখা মাত্রই সে বলে উঠলো, "তুমি কে এখানে কি মনে এসেছ?" আমি ওর কথার উত্তর দিলাম এই বলে, "আমি এই বনে এসে ছিলাম খড়ি যোগাড় করার জন্যে। কিন্তু গতকাল থেকে কিছু না খাওয়ার দরুন আমার শরীর ছিল খুবই ক্লান্ত। তাই আমার আর খড়ি যোগাড় করা হল না। আমার মাথা ফেটেছে একটা পথ দেখিয়ে বললো আমি কোথাও কোন খড়ি পেলে বাড়ির লোকে

কাছে আমার সমস্যার কথা বললে তারা কিছু খেতে দেবে। সেই ভরসাতেই এখানে এসেছি। আমি আর কথা বলতে পারছি না। খিদের জ্বালায় আমার মাথা ঘোরা করছে।"

—"তুমি এখানে দাড়াও, আমি এখনই আসছি।"

এই বলে সে বাড়ির ভিতর চলে গেল। আমি সেই গাছ তলায় বসে পড়লাম। দাড়াবার শক্তিটুকুও আমার দেহে অবশিষ্ট ছিল না। কতক্ষন বসে থাকার পর ঐ লোকটিকে আমার কাছে আসতে দেখলাম। তার হাতে দেখতে পেলাম কয়েকটা রুটি আর এক প্লেট

জমির মতো কিছু প্রাচীন জিনিস। আমার কাছে এসে ও বললেন, " এই রুটি কটা খেয়ে নাও।"

আমি তার সাথে কথা না বাড়িয়ে রুটি কয়টি খেতে শুরু করে দিলাম। আমার কাছে খাবার দিয়ে ঐ লোকটি আবার কে কোথায় চলে গেল। আমার যখন খাওয়া শেষ হলে, তখন ও আমার সামনে কয়েকটি পেয়ারা দিয়ে বললো, " এ গুলি খাও।"

আমি পেয়ারাগুলো হাতে নিয়ে বললাম, "পেয়ারা পেলে কোথায় ?"

— " আমাদের বাগের পেয়ারা।"

আমি পেয়ারায় কামড় বসিয়ে দিয়ে বললাম, " খুব মিষ্টি পেয়ারা তো।"

—" এ আমার নিজ হাতে লাগানো গাছের পেয়ারা।"
—"তাই নাকি!"
—"হ্যা। তোমাকে কি আরও কয়েকটা পেয়ারা এনে দেব।"
—"না থাক, অনেক হয়েছে।"
—"না, আমি বুঝতে পারছি। তোমার এখনো খিদে মিটেনি। আমি বরং আর কয়েকটা পেয়ারা নিয়ে আসি।"
এই বলে সে আবার চলে গেল। কিছুক্ষণ পর নিয়ে এল লুঙ্গি ভর্তি করে পেয়ারা। আমি বললাম, " এত পেয়ারা দিয়ে কি করবো।"
—" কি আর করবে, খাবে।"
—" এতগুলো খাব আমি! না এ আমি

পারবো না।"
—" তোমাকে পারতেই হবে।"
—" [illegible] না পারব না।"
—" পারতেই হবে।"
—" দেখ আমার বৌ তর চেয়ে। তার অন্য কিছুও হোল আমার বৌ [illegible] গেলে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে।"
—" তবুও তোমাকে যেতে হবে।"
অবস্থা কি আর বলব। যে নাছোড়-বান্দা ছেলের হাতে পড়েছি তাতে আর না যেয়ে পারা যাবে না। তাই বাধ্য হয়েই এক একটা বেলায় যেতে লাগলাম। না, আমি নিজে নই, ওই আমাকে যাওয়াতে লাগল। কারন যেখানে আমার [illegible]

সুখ বললো, "না না, আর না।" তখন ও বললো, "হ্যা হ্যা, আরও খাও।" তখন আমি নিজেও খেলেও বুঝতে হবে, ওই আমাকে খাইয়ে দিচ্ছে। এমনি ভাবে সকল প্রেম সব মেয়েরাই আমাকে খাইয়ে ছাড়লো। সব মেয়েরা-গুলো খাওয়ার পর ও ভাবীর ভিতর থেকে একটা খাঁটি এনে বললো, "এখানে বসে বিশ্রাম নেও।"

আমি ওকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। বুঝতে পারলাম, মেয়েটি নাদেরা ভাবীর হলেও উপস্থিত জ্ঞান আছে। এই সময়ে যে আমার বিশ্রামের প্রয়োজন তা ঠিক ও বুঝতে পারলো। আমি আর দেরী না করে খাটিতে

বসে আছি একটা গাছের সাথে হেলান দিলাম। কিছুক্ষণ পর বাড়ির ভিতর থেকে কয়েকজন বয়স্ক মহিলা এলেন। ওনারা এসে একের পর এক প্রশ্ন করে চললেন। আমার ভাগ্য ভাল যে, ওনারা এমন কোন প্রশ্ন করলেন না, যাতে আমার মিথ্যা কথা বলতে হয়। সুতরাং ওনাদের সব প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর-দিতে পারলাম। আমাকে যে মেয়েটি খাবার দিয়েছিল, সে একসময় কথা প্রসঙ্গে আমার কাছে জানতে চাইলো, "তুমি কি কোন কাজ করবে?"

আমি উল্টো ওকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কি ধরনের কাজ?"

—"এই ধর গৃহস্তের কাজ।"

—"হ্যা করতো। কিন্তু কোথায়?"

—"আমার পরিচিত একটা গৃহস্তের একটা লোকের প্রয়োজন ছিল। তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন তোমাকেই বরং তার কাছে নিয়ে যাই। কি বলো?"

—"তাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

—"তাহলে দুপুরে খাওযাব পর কিছুটা সময় বিশ্রাম নিয়ে ধীরে-সুস্থে রওনা দেয়া যাবে।"

—"ঠিক আছে।"

—"তুমি কি আর গোসল করেছ?"

—"না।"

—" তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি তোমার জন্য লুঙ্গি আর গামছা নিয়ে আসি।"

এই বলে সে আমাকে দাঁড় করিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর একটা লুঙ্গি আর একটা গামছা নিয়ে ফিরে এল। আমাকে ওগুলো দিয়ে বললো,

" এই নাও লুঙ্গি আর গামছা। আমার সাথে আসো। তোমাকে পুকুরটা দেখিয়ে দেই।"

আমি ওর সাথে যেতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর ও আমাকে পুকুরে দেখিয়ে বললো, " এখানে গোসল করে নাও। আর সাবধানে ঘাটে যেও। তা নইলে

পিছলে গিয়ে হাত-পাও ভেঙ্গে ফেলবে।" এই বলে সে একটা গাছতলায় দাড়িয়ে রইলো। যখন আমার গোসল করা-শেষ হলো তখন সে আমাকে ওদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। তারপর দুজনে মিলে অনেক বিষয়ে গল্প করলাম। যখন দুপুরে খাওয়ার সময় উপস্থিত হলো, তখন [illegible] পেছনে থেকে ঐ মেয়েলি কন্ঠে কে যেন বলে উঠলো, "নাসির ঐ ছেলেটিকে নিয়ে খেতে আয়।" আমি বুঝতে পারলাম আমার সাথের ছেলেটার নাম নাসির। এই কথা শোনা মাত্র সে আর দেরী করল না। আমায়-

নিয়ে গেল অন্য আর একটা ঘরে।
কিছুক্ষণ পরেই আমার সামনে খাবার হাজির করা হলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঐ ছেলেটি আমাকে একটা বিছানায় শুইয়ে দিল। ওর আদব-কায়দা এমন যে, আমি ভীষণ অভিভূত। তাই ও আমার সেবা-শুশ্রূষা করছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর ওর সাথে সেই গৃহস্থ পরিবারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সেখানে পৌঁছানোর পর ও বাড়ির কর্তার কাছে আমাকে হাজির করলো। বাড়ির কর্তাকে ও বললো, "চাচা এই ছেলেটি কাজ করতে চায়। আপনি

বলছিলেন না, আপনার কাজের দরকার। তাই এনে নিয়ে এসেছি।"

কর্তা অনেক ধরে আমাকে দেখলেন। তার পর জিজ্ঞেস করলেন, "আগে কোন দিন গৃহস্থের কাজ করেছ?"

আমি উত্তর দিলাম, "জি, না।"

– "এ কাজ সহ্য করতে পারবে তো।"

– "হ্যাঁ পারবো।"

– "আপাতত তোমাকে আমি পেটে-ভাতে* রাখলাম। কিছু দিন কাজ করার পর যদি কাজ শিখতে পার তাহলে তোমাকে বেতন দেওয়া হবে। তুমি কি এতে রাজী?"

পেটে ভাতে* হলো কাজের বিনিময়ে শুধুমাত্র খাবার আর পোষাক। বেতন নাই।

— "হ্যা, আমি বুঝি।"
— "তাহলে আমার কাছে তুমি থাকতে পার।"
তারপর আমার সাথের ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "নাসির, তুই কিন্তু চলে যাইসনা। কত দিন পর এসে ছিস একদিন থেকে যাইস।"
নাসির বললো, "না চাচা, বাড়িতে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। আমি না গেলে তার একটা কাজও আগাবে না।"
এই বলে নাসির রওনা দিল। কর্তা উঠে যেতে যেতে বলে উঠলেন, "সে কিরে এখনই যে যাচ্ছিস। অত দূর থেকে এসে-ছিস একটু জিরিয়ে যা।"
— "না চাচা, আজ আর জিরোবার সময় নেই। আর একদিন এসে জিরিয়ে যাবানে।"

এই বলে সে চলে গেল। আমি চাঁই পেলাম।

সে দিন আমার কোন কাজ করতে হল না। কারন দিন তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাড়ির কাদা-কাড়ি ঘোড়া-ঘুড়ি করে দিনের বাকী অংশটুকু কাটিয়ে দিলাম। রাতের খাবার সময় হলে আমাকে খেতে দেওয়া হলো। খাবার খেয়ে বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। মাদুরটি অবশ্য বাড়ির লোকেরাই দিলেন। আমার অল্প কিছুক্ষন পরে ঘুমিয়েও পড়লাম।

ঘুম থেকে উঠে বাড়ির পুকুর থেকে

হাত-মুখ পরিষ্কার করলাম। তারপর কর্তার সাথে চলে গেলাম মাঠে কাজ করতে।

জীবনে কোন দিন মাঠের কাজে হাত দেয়নি। তাই আমার কাছে এই কাজটি প্রথমে খুবই কষ্টের কাজ বলে মনে হলো। কিছু-মাস কাজ করার পর কষ্টটা একটু কমলো। প্রথম দিন আমার কাজ ছিল কোদাল দিয়ে লেবের চারি-পাশ পরিষ্কার করা। আমি আমার কাজ করে যেতে লাগলাম। যখন সকালের খাবার সময় হলো, তখন বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে হাজির হলেন কর্তার এক-

মাত্র ছেলে। ওর নামটা এখন অবশ্য আমার মনে পড়ছে না। আমরা খাবার পেয়ে খুব খুশী হলাম। বিশেষ করে আমি। হাত-মুখ বাড়ি থেকে আনা বোতল পানির সাহায্যে পরিষ্কার করে ফেললাম। তারপর খেতে বসলাম। খাওয়া শেষ করে কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে আবার ওদের কথা স্মরণ করে দিলাম। কিছুক্ষন পর রৌদ্রের তাপ প্রচন্ড পরিমানে বেড়ে গেল। রৌদ্রের তাপে আমার শরীর থেকে এক নাগারে ঘাম ঝরতে লাগল। তবুও আমাকে শক্ত হয়ে সব সহ্য করে তবু আর যেতেই হবে। তাই কষ্ট সহ্য

কাজেই কাজ করে যেতে লাগলাম। যখন দুপুরের খাবার সময় হলো তখন আমি আর কর্তা বাড়ি গেলাম। তারপর পুকুর থেকে গোসল করে নিলাম। আমার অতিরিক্ত কোন লুঙ্গি ছিলনা। তাই উনার একটা লুঙ্গি আমাকে পড়তে দিলেন। গোসল করার পর আমাকে খাবার দেয়া হল। খাবার খেয়ে কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে আবার মাঠে চলে এলাম। কর্তা আমার সাথে এলেন না। কারন, তখন রৌদ্রের প্রচন্ড তাপ ছিল। সেই তাপে রক্ত মাংসের গড়া মানুষের কাজ করা খুবই কঠিন। কর্তা হয়তো ভেবেছেন আমি রক্ত মাংসের

গত্যা মানুষই না। তাই আমাদেরই পাঠিয়ে দিলেন মাঠে কাজ করবার জন্যে। আমিও আর কি করবো। যখন উনার কাজ করছি তখন উনার কথা শুনতেই হবে।

নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে আমি আমার বাকী কাজ শুরু শেষ করতে লাগলাম। যখন সূর্য্যের তাপ কমলো, তখন কর্তা মাঠে এসে হাজির হলেন। কিন্তু কোন কাজ করলেন না। আমাদের শুধু এটা কর, ওটা কর ইত্যাদি বলে কাজ করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আমিও উনার নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে গেলাম। কাজ করতে করতে এক-

অবশেষে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল। তখন কর্তা আমাকে কাজ বন্ধ করতে বললেন। আমি কাজ বন্ধ করে কর্তার সাথে বাড়ি চলে এলাম। তারপর খাবার সময় হলে অন্যদিনের মত খেয়ে দেয়ে আমার বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। শোয়ার অল্প কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়েও পড়লাম। আর ঘুমটা একটু তাড়াতাড়িই হলো। কেননা আজ দিনটা রোদ্র খাটুনির উপর।

ঘুম থেকে উঠে অন্য দিনের মত হাত-মুখ পরিষ্কার করে কর্তার সাথে

আমার জামের ২০ মাঠে চলে গেলাম। আমার অনেকের কাজ হলো লাঙল দিয়ে জমি চাষ করা। আমি জীবনে কোন দিন লাঙল হাতে ধরিনি। তাই লাঙল ধরার সাথে সাথে আমার মনের ভিতর কেমন কেমন যেন করতে লাগল। কর্তা ছিলেন আমার সামনে। উনি আর একটা লাঙল নিয়ে জমি চাষ করে চললেন। আগেই তো আমার লাঙল ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাই আমি আর বিলম্ব না করে ওনার পিছন পিছন লাঙল দিয়ে জমি চাষ করে চললাম। কিছুক্ষণ পর একটা

* আমার জীবনের সত্যকথা *

ছেলেকে দেখতে পেলাম খাবার নিয়ে আমাদের এ দিকেই আসছে। আমি বুঝতে পারলাম যে, ঐ ছেলেটা কর্তারই একমাত্র ছেলে। ও যখন আমাদের কাছে এল, তখন কর্তা আমাকে কাজ বন্ধ করতে বললেন। আমি কাজ বন্ধ করে ওনার সাথে হাত-মুখ পরিষ্কার করে খেতে বসলাম। আমরা খেতে বসলাম একটা গাছতলায়। বাইরে বসে খাওয়ার একটা অন্যরকম তৃপ্তি আছে। সাধারন খাবারকেও অনেক স্বাদের মনে হয়। তাই সাধারন ডাল-ভাত খেয়েও আমার মনে হলো আমি যেন রেস্টুরেন্টের খাবার খাচ্ছি। আমি বুঝতে

পারলাম নিয়মিতই শুধু স্বাদ পরখ করে না। স্বাদ পরখ ছাড়া অন্য আরও একটি বস্তু জিনিস রয়েছে। যার নাম মন। এই মনের কারণেই স্বাভাবিক খাবার আমার কাছে এত সুস্বাদের মনে হতে লাগল। কারন আমি যেখানে বসে খাবার খাচ্ছি তার চারপাশে মানব জন্য অনেক সুস্বাদু খাবার রয়েছে। এই মনের খাবারের জন্যই নিজের খাবারকে আমার কাছে সুস্বাদু মনে হলো।

খাওয়া-দাওয়া শেষে আমরা আবার জমি চাষ শুরু করে দিলাম। এবারও আমি কর্তার পিছন পিছন জমি চাষ

করে চললাম। এই সময়ে একটা হাস্য-কর ব্যাপার ঘটলো। পাঠকগণের কৌতু-হল নিবারণের নিমিত্ত এবার সেই ঘট-নাটিই উল্লেখ করছি।

আমি কর্তার পিছন পিছন জমি চাষ করে চলেছি। হঠাৎ আমার হালের গরু দুটো আমার কথা না শুনে লাফিয়ে শুদ্ধ জমি থেকে জঙ্গলের মধ্যে উঠে গেল। আমি কর্তার পিছন পিছন ছিলাম বলে কর্তা এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন না। মোড় ঘুরতেই যখন তিনি দেখলেন, আমি ওনার পিছনে নেই, তখন খুব ঘাবড়ে গেলেন। বিড় বিড় করে কি যেন পড়ে

বুকে ফুঁ দিলেন। তারপর আমার নাম ধরে ডাক দিলেন। আমি সাড়া দেওয়ার পর আমার সরু দুটো সহ কফিন থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। তারপর আচ্ছা করে একটা ধমক দিয়ে বললেন, " যে সময় সরু দুটো কফিনের মধ্যে ঢুকতে দিল সে সময়ে তুমি আমাকে ডাক দিলি না কেন ?"

—" বাবে, আমি তখন সরু দুটা ঠেকাতে না আপনাকে ডাক দেবো।"

—" আমি এখন বুঝতে পারছি। এ গুলো শয়তানের কাজ।"

—" কি যে বলেন, এই বলে শয়তান

আসবে কোত্থেকে ?"

- " তুমি কি কচি খোকা নাকি । মানুষ এই-সব শয়তান আসবে কোত্থেকে । এইসবই তো শয়তান বেশী ।"

- " আমি কিন্তু ভাই শয়তান বিশ্বাস করি না ।"

- " তা করবা কেন, খাটি মুসলমান হলে ঠিকই করতে ।"

আমি বুঝতে পারলাম ওনার সাথে কথা বলে কোন লাভ হবে না । তাই তখনকার মতো চুপ করে রইলাম । ঃ

সেদিনের মত কর্তা ও অসন্তুষ্ট ভাবে ইতি টানলেন । আমি বুঝতে পার-লাম ভয়ের কারণেই তিনি এমনটি করছেন।

বাড়ি এসে উনি সব লোকের কাছে আম-দের এই ঘটনাটি বর্ণনাও করে শুরু করলেন। এই কথাটি শুনলে অবশ্যই হাসার কথা। কিন্তু তারা একটুও হাসলেন না। বরং ঘটনাটি শুনে আরও ভয় পেয়ে গেলেন। কর্তা নিজে গিয়ে এক ফকির মত লোককে কোথা থেকে ধরে নিয়ে এলেন। ফকিরকে বললেন, “বাবা, আমার ছেলেটা এই বয়সে জ্বরজ্বালে জ্বরজ্বানি একটু ভুগছিল। আবার তো উপদ্রব বেড়েছে।”

ফকির এক হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, “কুছ পরোয়া নেই। এখনই আমি এই

বন থেকে শয়তান তাড়িয়ে দিচ্ছি।"
এই বলে তিনি নানা রকম ভঙ্গিতে কি
যেন সব বলতে লাগলেন। ওনার অদ্ভুত
কাণ্ডখানা দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে
গেলাম। কিছুক্ষণ উনি ওনার মন্ত্র পাঠ
করে বললেন, "আর কোন ভয় নেই।
চিরদিনের মত শয়তান এই বন থেকে তাড়িয়ে
দিলাম।"
তখন সবার মুখ হাসিতে ভরে গেল।
কর্তা ফকিরকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন,
"চলেন আপনাকে আমি এগিয়ে দিয়ে আসি।"
—"তাই চলো, বাবা।"
কর্তা তখন ফকিরের সাথে বাড়ির বাইরে
চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি একা—

বাড়িতে এলেন। আমি বুঝতে পারলাম না সাধারন একটা ব্যাপারকে এত বড় করে দেখার কি মানে হতে পারে। সে দিন আমার কোন কাজই করতে হলো না। না, না করে দিল। সে কাজ হলো সবার কাছে আর-কের ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরন দেওয়া। আর আমার ঘুমটা একটু দেরীতেই হলো। কারন রাতেও ওদের কাছে আমার বলতে হয়েছিল আসলেতে ঘটনাটির কথা।

কিছুদিন কর্তার এখানে কাজ করার পর যখন মোটা মোটি কাজ শিখ-লাম তখন কর্তা একদিন বললেন, "হ্যাঁরে, ভোরে একটা লোকে কাজে নিতে চায়। দেবে ১৫০০ টাকা। তুই কি এতে রাজী।"

আমি সম্মতি দিলে উনি আমাকে সেই লোক-টির কাছে নিয়ে গেলেন। সেই লোকটা কর্তার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। কর্তা আর ওনার কথা বার্তায় মাধ্যমে আমি বুঝতে পারলাম, ওনার নাম রবিউল। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি?"

– "মনির।"

– "বাড়ি কোথায়?"

– "বরিশাল।"

– "মা-বাবা আছে?"

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে উত্তর দিলাম, "হ্যা আছে।"

– "বাবা কি করেন?"

— " চাকরী করেন।"
— " তাহলে তুমি এ কাজ করতে এলে কেন ?"
আমি অনেকক্ষন ভেবে-চিন্তে উত্তর দিলাম,
" জি, বাবার চাকরীটা অতি সামান্য তাই।"
উনি আমাকে আর কোন প্রশ্ন করলেন না।
পাঠকগন আপনারা হয়তো আমাকে বলবেন,
আমি মিথ্যেবাদী। কিন্তু আমি মিথ্যে
কথা বলিনি। অতি কষ্টে সত্যকে গোপন
রেখেছি মাত্র। আমার বাবার চাকরীতে
আমাদের পরিবারের সকলের খেয়ে দেয়ে,
খুব ভাল ভাবেই চলে যায়। তবুও এমন
লোক আছে যারা আমার বাবার চেয়েও
বড় চাকরী করেন। আবার এমন লোক
আছেন যারা আমার বাবার চেয়েও ছোট

চাকরী করেন। যারা আমার লেভেল থেকেও বড় চাকরী করেন, তাদের কাছে হয়তো আমার লেভেল চাকরীটা অতি সামান্য। আমি সেই দিক দিয়েই ওনার কথার উত্তর দিলাম। তাই বলে আমার লেভেল চাকরীর থেকেও যারা ছোট চাকরী করেন, তাদেরকে আমি বলছিনে যে তাদের চাকরীটা অতি সামান্য। বরং তাদের চাকরীই আমার লেভেল চাকরীর থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

সে যাই হোক আমাকে উনি কাজে নিলেন মজুর হিসেবে। প্রতি রোজ ১৫০০ টাকা। তাছাড়া, খাওয়া-দাওয়া ওনার ঘরেই। কিন্তু আমি জানতাম যে,

আমার এই দীর্ঘ্য একটা বছর উনার প্রধানে কাম করা হবে না। কারন আমি মেসে থেকে বে হয়ে ছিলাম কয়েকদিন এই দেশ দেখার জন্য। তার মানে এই না যে, আমি আমার সত্য কথার ইতি টেনে জীবনটাকে বরবাদ করে দেবো। তাই একদিন ঠিক করে ফোনলাম রবিউল ভাইকে সব কথা বলবো। উনাকে আমি রবিউল ভাই বলেই সম্বোধন করতাম।

পরের দিন আমার সব কথা উনাকে খুলে বললাম। উনি খুব ভাল মানুষ ছিলেন। আমার সব কথা শুনে একটুও রাগ করলেন না। বরং হেসে হেসে

বললেন," থাক বাবা, অনেক হয়েছে। এখন তুমি তোমার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেও। তোমার মা-বাবা হয়তো তোমার জন্য চিন্তায় চিন্তায় পাগল হয়ে গেছে।"
আমি বললাম," তাহলে আজই রওনা দেই।"
–" সে কি! আজ কেন? আজ আমার এখানে বেড়ায়ে যাও। কাল ভোরের দিকে রওনা দিও।"
আমিও ওনার কথায় সায় দিলাম।
সেই দিনটা কেটে গেল খুবই আনন্দের সাথে।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ পরিষ্কার করলাম বাড়ির জোদ্দার একটা

পুকুর থেকে। তারপর রবিউল ভাই-এর স্ত্রী আমাকে খেতে দিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর রবিউল ভাই আমাকে ৭৫ টি টাকা দিয়ে বললেন, "আবার বেড়াতে এসো।"

—"ইনশাআল্লাহ আবার আসবো।"

আমাকে বিদায় জানাতে রবিউল ভাই, তার স্ত্রী, মা, এবং আরও অনেকে এলেন। আমি যখন ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, তখন সবাই আমার জন্য দোয়া করলেন।

আমি খাল বন দেখতে দেখতে বনের ভিতরের সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। এমনি ভাবে এক সময় রামকৃষ্ণপুর

রেল ষ্টেশনে পৌছে গেলাম। কিছুক্ষণ পরই ট্রেন এলো। তখন কাউন্টার থেকে দশ টাকা দিয়ে একটা টিকিট কিনে নিলাম। টিকিট টা অবশ্য ঢাকা যাবার। তারপর ট্রেনে চড়ে বসলাম।

অল্প কিছুক্ষণ পরই ট্রেন ছেড়ে দিল। এবং আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ট্রেন দ্রুত গতিতে মাঠ বন অতিক্রম করে যাচ্ছে। আমার মনে হলো, ট্রেন দাড়িয়ে রয়েছে। আর গাছ গুলো পিছনের দিকে দৌড়াচ্ছে। ১ঘন্টা পর ট্রেন কমলাপুর রেল ষ্টেশনে থামলো। আমি ট্রেন থেকে নেমে লোকজনদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে করতে চলে গেলাম সদর ঘাটে। সদর ঘাটে এ দেশের বিভিন্ন জায়গায়

যাওয়ার জন্য লঞ্চ থাকে। আমি খোঁজ করতে লাগলাম বরিশাল যাওয়ার জন্য কোন লঞ্চ পাওয়া যায় কিনা। লঞ্চ পেলাম ঠিকই, কিন্তু ছাড়তে তখনও অনেক দেরী। তখন দুপুর হয়ে গেছে। আমার পেট মানিয়ে দিল আমাকে এখন কি করতে হবে। পেটের কথাকে আমি যুক্তি মনে করে চলে গেলাম একটা বেকারীতে। উদ্দেশ্য কিছু খাবার। বেকারী থেকে দুটো পাউরুটি কিনলাম। একটা সেখানে বসেই খেয়ে নিলাম। আর একটা রাখলাম লঞ্চে বসে খাওয়ার জন্য। তারপর লঞ্চের ছাদে উঠে বুড়ি গঙ্গা নদীর অসংখ্য পাল তোলা নৌকা দেখতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে এক সময় লঞ্চ ছাড়ার বেল বেজে উঠলো।

বিকেল ৫টার সময় লঞ্চ সদর ঘাট থেকে ছেড়ে দিল। সে (লঞ্চ) তার ধীর গতি আসন্ন গতি নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। লঞ্চের একজন যাত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম আজ ২০ই সেপ্টেম্বর। বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম ১৭ই জুলাই। হিসাব করে দেখলাম আমার ভ্রমণ করা হয়েছে ৬৫ দিন। অংক হিসাবে বলতে গেলে বলা যায় ~~আমার~~ ২ মাস ৫ দিন। কিন্তু জুলাই আর আগষ্ট মাস ৩১ দিনের হয়ে যায় আমার ভ্রমণ করা হয়েছে ২মাস ৩ দিন। আর ভ্রমণ

কারণে ব্যয় হয়েছে ২৫০০ টাকা। না, ২৫০০ টাকা নয়। মাত্র ৯০০ টাকা। কারণ কি? কারণ তো আমার কথায় আস্থা রাখে না। আপনারাই তো তা জানেন।

ধীরে ধীরে রাত হয়ে এল। লঞ্চ হয়তো এখন ঢাকা থেকে অনেক দূর এসে গেছে। অন্ধকারের দরুন বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মাঝে মধ্যে তারার মতো কতকগুলো ছোট ছোট আলো দেখা যাচ্ছিল। ওগুলো কতক্ষণ পর নিভে যাচ্ছিল, আবার জ্বলে উঠছিল। লঞ্চের একটা পুলিশ এক সময় আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "যাবে কোথায়?"

—"বরিশাল।"

— " টিকিট নিয়েছ ? "
— " না । "
— " তোমার টিকিট নিতে হবে না । আমাদের ২০ টা টাকা দেও, তোমাকে তোমার স্থানে নামিয়ে দেবানে । "
আমি খুব খুশী হয়ে উনার কথায় রাজী হয়ে গেলাম । কারন আমার মনে হয়েছিল বরিশাল থেকে নিশ্চই ২০ টাকার বেশী দরকার । তাই উনাকে (পুলিশকে) ২০টা টাকা সাথে সাথে দিয়ে দিলাম ।

আমার গন্তব্য স্থান বরিশালেই । কিন্তু বরিশাল সদর নয় । জিকাবপুর লঞ্চ ঘাট । জিকারপুর লঞ্চ ঘাটটির পাড়ে

স্টেশনটির নাম উজিরপুর। আমার নানা বাড়ি হলো শিকারপুর আর দাদা বাড়ি হলো উজির-পুর। ঠিক করলাম শিকারপুরেই নামবো। অকাল নয় টার সময় লঞ্চ শিকার-পুর ঘাটে থামলো। আমি ওতি যতি করে লঞ্চের সদর দরজার কাছে এলাম। দর-জায় কয়েকটা লোককে দেখলাম, যাত্রীদের টিকিট চেক করে নিয়ে তারপর লঞ্চ থেকে নামতে দিচ্ছে। পুলিশটি বলেছিল যে দরজার আশে পাশে থাকতে। কিন্তু অনেক খোঁজা-খুজির পরও তাকে পেলাম না। এদিকে আমার লঞ্চ ছেড়ে দেবার সময়ও হয়ে এসেছে। তাই বাধ্য হয়েই আস্তে আস্তে

দরজার দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। দরজার কাছে যে যাওয়ার সাথে সাথেই একটা লোক সাথে সাথে বলে উঠলো, "এখানে নামবে ?"

আমি উত্তর দিলাম, "হ্যা।"

— "টিকিট কোথায়।"

— "টিকিট তো নাই।"

— "কোন জায়গা থেকে আইছ।"

— "ঐ ঢাকা।"

— "২০ টাকা দাও।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম ঢাকার আসল ভাড়াই ২০ টাকা। তবে পুলিশটিকে ২০ টাকা দিতে গেলাম কেন। মনে পড়লো একটা প্রবাদ প্রবচনের কথা। কথাটি হলো,

"অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।" আমি আর দ্বি করব। আমার কাছে তখন 20৳ টাকাই অবশিষ্ট ছিল। এদিকে আমাদের আমার এই স্টেশনে নামতেই হবে। তাই ২০ টাকা দিয়ে লঞ্চ থেকে নেমে পড়লাম।

তারপর নানাবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমার নানাবাড়ি বাহের চর গ্রাম। জিকারপুর হতে যার দূরত্ব মাত্র ১ মাইল। আমি হাটছি আর মনে মনে বলছি, 'পরিচিত কোন লোকের দেখা যেন না পাই।' কিন্তু তাই হলো দেখলাম সামনে আমার পরিচিত একটা

লোক। উনি আমার দিকেই আসছেন।
সম্ভবত শিকারপুরে যাচ্ছেন কোন কাজে।
আমি মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলাম।
তারপর ওনার সামনে দিয়ে মাথা নত ক
করে চলে যেতে লাগলাম। কিন্তু তবুও
আমাকে উনি চিনতে পারলেন। চিনতে পেরেই
আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর
ওনার সমস্ত কাজ বন্ধ দিয়ে আমাকে
বাড়ি নিয়ে চললেন।

নানা বাড়ির কাছে যেতে যেতেই
নানি আর খালাম্মা এসে আমাকে
জড়িয়ে ধরলেন। নানা বেঁচে ছিলেন না।
তিনি পাঁচ বছর আগে নিউমোনিয়ায়
পরলোকগমন করেছেন। নানি আমার

খালাম্মারা যখন আমাকে জড়িয়ে ধরে-ছিলেন তখন আমার কি অবস্থা হয়েছিল, তা তো আপনারাই অনুভব করতে পারছেন। তারপর উনারা কান্না থামিয়ে আমাকে নিয়ে চললেন বাড়ীর ভিতরে। নানা বাড়ীর উঠোন ছিলো অনেক বড়ো। আমাকে দেখার জন্য এত লোক জড়ো হয়েছিল যে, উঠোনও তাদের জায়গা করে দিতে পারলো না। আমাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে একটা খাটে শুইয়ে দেওয়া হলো। অনেকদিন এই রকম খাটে শুইনি। তাই শোয়ার সাথে সাথেই খুবই আরাম বোধ করতে লাগলাম। সেদিনটা কেটে গেল খাটে শুয়ে শুয়েই। মাঝে

শুধু খাবার দেওয়া হতো। তাও খাটে বসে খেতে হতো। কেউ আমাকে খাট থেকে উঠতে দিতে চাইতো না। দুপুর বেলা শুধু একবার উঠতে পেরেছিলাম গোসল করার জন্য। গোসল করার পর আবার বিছানায় শুতে হলো।

দুই দিন পর বাবা খবর পেয়ে পাশা বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। তার একদিন পর উনার সাথে মাওয়ায় চলে এলাম। আমাকে প্রথম দেখে মা একটা কথাও বলতে পারলেন না। এমনকি একটু কাঁদলেনও না। শোকে দুঃখে হয়তো তিনি পাথর হয়ে গিয়েছিলেন।

কিছুক্ষন পর আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদিতে সুরু করে দিলেন। তখন প্রতিজ্ঞা করলাম জীবনে মা-বাবাকে কষ্ট দিয়ে আর দেশ ভ্রমনে যেতে হবে না।

পরের দিন স্কুলের পোষাক পরে বই-খাতা নিয়ে স্কুলে উপস্থিত হলাম। সহপাঠীরা প্রথমে আমাকে দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গেল। বিভিন্ন পিরিয়ডে এক এক জন স্যার আসতে লাগলেন আর আমার ভ্রমন কাহিনী শুনতে লাগলেন। আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপেই আমার ভ্রমন কাহিনী ওনাদের কাছে বললাম। এমনি ভাবে কেটে যেতে লাগলো

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কথা বলতে বলতে আমার মুখ ব্যাথা হয়ে গেল। তবুও স্যারেরা আমাকে ছাড়লেন না। এক সময় ক্লাস ছুটির ঘন্টা বেজে উঠলো। তখন ওনাদের হাত থেকে আমি রক্ষা পেলাম।

পরের দিন আমাদের স্কুলে কৃষি চর্চা বিষয়ক আকবর স্যার ওনার কৃষির চর্চা ক্লাসে ছাত্র দের সামনে আমার ভ্রমন কাহিনী বলতে বললেন। আমি একরকম ভয়ে ভয়েই ওক সবার সামনে উপ-

লিত হলাম। তারপর কয়েকবার চোক গিলে আমার কাহিনী বলা শেষ করলাম।

আমি আর লিখতে পারছি না এজন্য আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আগে যদি জানতাম লেখায় এত কষ্ট তাহলে এ পথে আর পা বাড়াতাম না। আপনাদের সকলকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি।

— মো: মনিরুজ্জামান
(মনির)

২৭-৮-৯১

* সমাপ্ত *